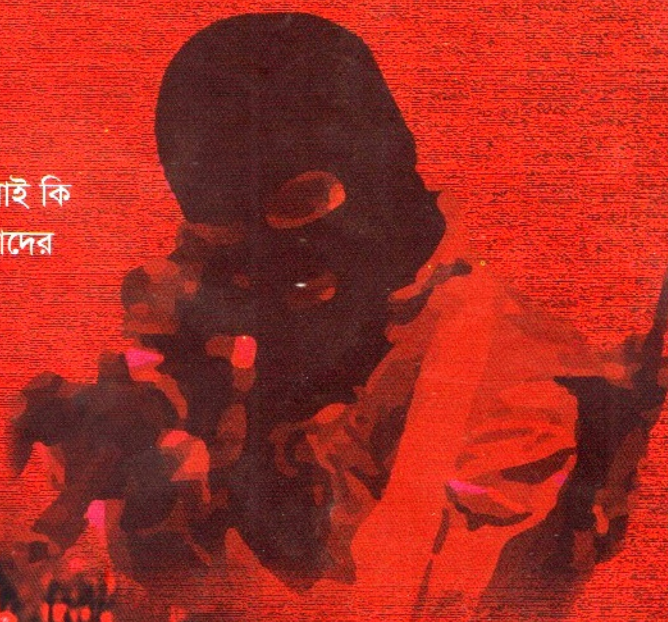
INTERNATIONAL BESTSELLER

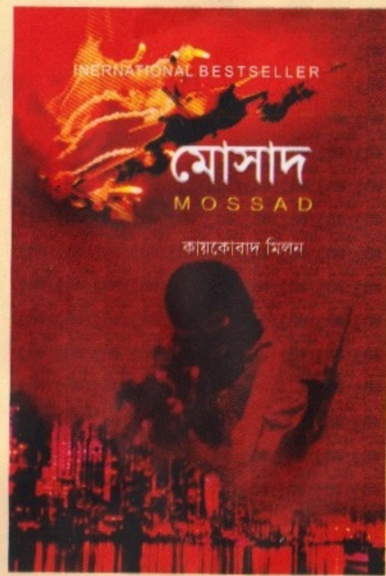
মোসাদ

MOSSAD

কায়কোবাদ মিলন

মুসলিম দেশগুলোই কি
ইহুদী গোয়েন্দাদের
টার্গেট?





মোসাদ বইটি বছরব্যাপী **আবিষ্কার**'র বেস্ট সেলার। বইটি প্রকাশ পায় ২০১৭ সালের অমর একুশে বইমেলার শেষ প্রান্তে। এরই মধ্যে চতুর্থ মুদ্রণ চলছে। বাংলাদেশের অনলাইন বুক মার্কেটিংয়ে সেরা প্রতিষ্ঠান **রকমারি ডট কম**-এর বেস্ট সেলারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে মোসাদ। ২০১০ সালে বইটি যখন ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশ পায় ৭০ সপ্তাহ ধরে এটি ছিল বিশ্বের বেস্ট সেলার। বাংলাদেশেও এটি বেস্ট সেলার হতে চলেছে।

সময়ের স্বল্পতার জন্য তখন পুরো বইটি অনুবাদ ও মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। ২০১৮ বই মেলার আগেই প্র'কশিত হয়েছে মোসাদ'র দ্বিতীয় খণ্ড

মোসাদ বিশ্বের ভয়ঙ্করতম গোয়েন্দা সংস্থা। ইসরাইলি এই সংস্থাটির দুঃসাহসিক অভিযান নিয়েই এই বই।

আবিষ্কার থেকে প্রকাশিত লেখকের বই

- **ভয়ঙ্কর মোসাদ**
- **একাত্তরে পরাশক্তির যুদ্ধ**

মোসাদ

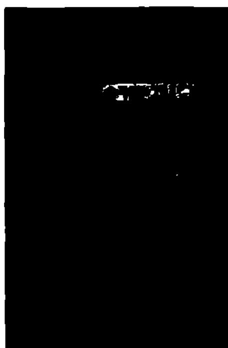
চতুর্থ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪২৪
নভেম্বর ২০১৭

মোসাদ

কায়কোবাদ মিলন

মূলঃ মিশায়েল বার- জোহার

নিসিম মিশাল



আবিষ্কার

মোসাদ

অনুবাদ	◘ কায়কোবাদ মিলন
প্রকাশক	◘ এসডি হাসান
সহযোগিতা	◘ বাইটব্যাক পাবলিশিং, লন্ডন
প্রকাশনা	◘ আবিষ্কার কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫।
প্রকাশকাল	◘ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
প্রচ্ছদ	◘ ধ্রুব. ই. আকাশ
ছাপাকল	◘ কেয়ার প্রিন্টার্স, কাঁটাবন
মূল্য	◘ ২৫০ টাকা

MOSSAD
Kaikobad Milan

Publisher	: ABISHKAR, CES Complex, Kantabon, Dhaka 1205 Phone: +88-02-9674099, 01762 562090 E-mail: abishkarpublicationdhaka@gmail.com
Published	: February 2017
Printers	: Care Printers, Katabon
Price	: Tk 250 Or US $ 10.00 Printed in Bangladesh ISBN: 978-984-92116-4-8

পরিবেশক

রকমারিডটকম, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ॥ বাতিঘর, চট্টগ্রাম ॥ মুক্তধারা, আমেরিকা ॥
সঙ্গীতা লিমিটেড, যুক্তরাজ্য ॥ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস্ কানাডা

উৎসর্গ

বিচারপতি রাজিক আল জলিল
দার্শনিক জি.এম কাওসার রোমান
সাংবাদিক আবু জাফর সূর্য

ভূমিকা

ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারি একটি নাম। বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে এটি বিশেষভাবে বিবেচিত। সেই মোসাদের ভয়ংকরতম অপারেশন, নেপথ্যের কাহিনী নিয়ে বই লিখেছেন মিশায়েল বার-জোহার এবং নিসিম মিশাল। মোসাদের ষাট বছরের সবচে ভয়ংকর, নিন্দিত, বিতর্কিত ও সংকটাপন্ন মিশনগুলো এমনকি ইহুদি ইসরাইল রাষ্ট্রে এবং আরব বিশ্বের ষড়যন্ত্র নিয়ে এই বই। এর প্রতিটি ঘটনাই সত্য ও বাস্তবিক। ইন্টেলিজেন্স যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ রয়েছে তাদের কাছে এই বই এক অমূল্য সম্পদ। প্রথমোক্ত লেখক জোহার চারটি ইসরাইল – আরব যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মোসাদ কাহিনী কিভাবে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আরব ভূখন্ডসহ বিশ্বের তাবৎ গোয়েন্দাদের সঙ্গে মোসাদ কিভাবে ডাবল, ট্রিপল এজেন্ট হয়ে প্রতিপক্ষকে খুন করে তার সঙ্গে উঠে এসেছে ফিলিস্তিনি গোয়েন্দা ব্লাক সেপ্টেম্বরের অত্যাধুনিক গেরিলা কাহিনী। মিশাল টিভি ব্যক্তিত্ব এবং ইসরাইলের সরকার নিয়ন্ত্রিত টিভির মহাপরিচালক। ২০১০ সালে বইটি যখন প্রথম লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় তখন এক নাগাড়ে ৭০ সপ্তাহ বইটি ছিল বিশ্বে বেষ্ট সেলার।

ভারতের ট্রেনে বইয়ের কয়েকটি পাতা পড়ার পর মনে হল বাংলাভাষার পাঠকের বইটি পড়া উচিত। তাই এই প্রয়াস। আমাদের দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে কয়েক লক্ষ সদস্য রয়েছেন। সত্যিকার গোয়েন্দা কাহিনী ও ইতিহাসের উপাদান জানার আগ্রহ কোটি লোকের। তারা এই বইটি পড়তে যে আগ্রহী হবেন তা হলফ করে বলা যায়। গত বছর আমার লেখা একাত্তরে পরাশক্তির যুদ্ধ বইটি খুব নাম করেছিল। সেই বইয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ- কালের বিভিন্ন দেশের মোস্ট সিকরেট চিঠিগুলা ফাঁস করেছিলাম। আর এবারের বইটি আরও অনন্য সাধারণ। এমন বই বাংলায় সত্যিই আর হয়নি। ইতিমধ্যে 'মোসাদ ২' প্রকাশিত হয়েছে।

এই বই অনুবাদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই পীরসাহেব আলহাজ্ব মঞ্জিল মোরশেদ, মিডিয়া জগতের শীর্ষ নেতা ও সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, ইত্তেফাকের সাবেক জেনারেল ম্যানেজার ও পূর্বানী সম্পাদক খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন, জাতীয় মহিলা সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) মাসুদা হোসেন, চ্যানেল আই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, মামা ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ হাবিবুর রহমান, বন্ধুবর অধ্যক্ষ আবদুস সালাম হাওলাদার, অধ্যাপিকা শিরীন আফরোজ, আন্টি মমতাজ বেগম রোজী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট আশিক আল জলিল, মোশতাক মোরশেদকে। কেননা এই বই অনুবাদের ব্যাপারে তারা উৎসাহ দিয়েছিলেন। বইটি অনুবাদে আমার আম্মা আলহাজ্ব সাজেদা রহমান যাঁকে আমরা বলি 'বরিশালের বেগম রোকেয়া' তাঁরও অবদান কম নয়। বর্তমানে তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁর জন্য দোয়া চাই। আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা দিলরুবা জলিল দিনকে দিন আমাকে তার গুনমুগ্ধ করে তুলছেন। এক বিচারপতির মেয়ে, আরেক বিচারপতির বড় বোন এই ভদ্রমহিলা অনেকের কাছেই অনুকরণীয় এবং দশভূজা।

ইত্তেফাকের আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ফজলুল হক, সাংবাদিক-সম্পাদক শাহজাহান আলী ও ওয়াহিদ মুরাদ, জাতীয় প্রেসক্লাব লাইব্রেরিয়ান ইমরান খান, সাহিদউল্লাহ, সাংবাদিক কাজী ফরিদ, অনুজ গীতিকার জুলফিকার চমন ও জিএম সরোয়ার মোহনকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। ইন্টারনেট থেকে ছবি সংগ্রহ করে সহযোগিতা করেছেন প্রেসক্লাবের মিডিয়া সেন্টার সহকারী আসাদ। পুত্র ইভান ও সুমাইয়াকে ধন্যবাদ বিভিন্ন পরামর্শের জন্যে।

হাজারও সালাম হাক্কোননূরে।

কায়কোবাদ মিলন
kaikobadmilan1955@gmail.com

সূচিপত্র



আম্মানে মোসাদের কলঙ্ক

বাবা বাবা বলে চীৎকার করে ছোট্ট একটি মেয়ে কালো জীপ থেকে নেমে বিশাল একটি ভবনে দৌড়ে গেল। এই ভবনেই রয়েছে তার বাবা। ঘটনাস্থল জর্ডানের মধ্য আম্মান।

বাবা বলে চীৎকার করতেই মোসাদের একটি পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। মোসাদের ইতিহাসে এটা বড় ধরনের একটা ব্যর্থতা।

অভিযানটি সুপরিকল্পিত হলেও কোথায় যেন একটা অস্বস্তি ও অগোছালো ভাব ছিল। এতদসত্ত্বেও এই অভিযান সাফল্যের মুখ দেখার কথা। অভিযানের মূল লক্ষ্য হামাসের নবনিযুক্ত রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান খালেদ মাশালকে হত্যা। ৪৫ বছর বয়সি খালেদ মাশাল একজন কম্পিউটার প্রকৌশলী। সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি ও সুদর্শন খালেদ মাশাল হামাসের রাইজিং স্টার বা উদীয়মান তারকা। তবে গত কয়েক বছরে তিনি ইসরাইলের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির মাধ্যমে আইজাক রবীন ও ইয়াসির আরাফাত শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কিন্তু ১৯৯৭ সালের ৩০ জুলাই জেরুজালেমে বোমা হামলার পর মোসাদ মাশালকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা ঐ হামলায় ১৬জন ইসরাইলী নিহত এবং ১৬৯জন আহত হয়।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মন্ত্রীপরিষদের জরুরি বৈঠক ডেকে একজন হামাস নেতাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তখন মোসাদের

প্রধান ছিলেন ১৯৯৬ সালে নিয়োগ পাওয়া জেনারেল ড্যানী ইয়াতোম। প্রধানমন্ত্রী তাকে দায়িত্ব দেন কোন হামাস নেতাকে হত্যা করা ইহুদি এবং ইসরাইলের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক।

জেনারেল ইয়াতোমের রয়েছে দীর্ঘদিনের সামরিক ক্যারিয়ার। তেল চকচকে বলিষ্ঠ টাক মাথার এই জেনারেলের মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকতো। ইসরাইলের সেন্ট্রাল কমান্ডো মেজর জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ড্যানী ইয়াতোম। প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবীনের প্রতি তার ভালবাসা ও আনুগত্য ছিল নিরঙ্কুশ। রবীনের সামরিক সচিবও ছিলেন তিনি। রবীনের মৃত্যুর পর অনেককে অবাক করে দিয়ে ইয়াতোম মোসাদের প্রধান নিযুক্ত হন। সামরিক বাহিনীতে তার রেকর্ড ও দক্ষতার কথা যারা জানেন তারা এই নিয়োগের প্রশংসা করলেও অনেকেরই এই নিয়োগ মনঃপুত ছিল না। তাদের ধারণা ছিল মোসাদের মত গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানের পদে যে ধরনের চৌকষ লোক আসা উচিত-ইয়াতোমের কিছু একটা ঘাটতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মোসাদ প্রধান হিসেবে ইয়াতোম হয়ত বেস্ট চয়েজ ছিলেন না কিন্তু প্রয়াত রবীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েই হয়ত এই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

১৯৯৭ সালের আগস্টে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে ইয়াতোম তেল আবিবের মোসাদ সদর দফতরে এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। ইসরাইলের কাছে মোস্ট ওয়ানটেড হামাস নেতাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তখন মোসাদের কাছে ছিল না। হামাসের সবচে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন মুসা মোঃ আবু মারজুক। তাকে হত্যার সমস্যা হল তার রয়েছে আমেরিকান পাসপোর্ট। তাকে মারলে আমেরিকার সাথে বিরোধ হতে পারে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় সেদিক থেকে খালেদ মাশাল সুইটেবল টার্গেট। কিন্তু সমস্যা হল তার অফিস আম্মানে অবস্থিত। এদিকে ১৯৯৪ সালে জর্ডানের সঙ্গে ইসরাইলের শান্তি চুক্তি হয়েছে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী রবীন প্রয়াত হলে জেনারেল ইয়াতোমের জর্ডানে অভিযান চালাতে বাধা কী। এমনটা অন্তর্গত মনোভাব হয়ত ছিল ইয়াতোমের। মাশাল জর্ডানে অবস্থান করলেও ইয়াতোম তাকে কতল বা হত্যা করা হোক বলে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কাছে প্রস্তাব দেন। গোয়েন্দা বাহিনী কায়সারেয়াও এতে অনুমোদন দেয়।

নেতানিয়াহু খালেদ মাশালকে হত্যার অনুমোদন দেন তবে শর্ত হল আম্মানের সাথে যাতে কোন সংকটের সৃষ্টি না হয়। প্রধানমন্ত্রী চুপচাপ এই অপারেশনের নির্দেশ দেন। ইয়াতোম এই হত্যার দায়িত্ব দেন মোসাদের কিডন গ্রুপকে। এরাই কায়েশারেয়ার এলিট গ্রুপ। মোসাদের গবেষণা বিভাগের কেমিস্ট্রির ডাক্তার খালেদ মাশালের শরীরে মারাত্মক বিষ প্রয়োগের পরামর্শ দেন। মোসাদের নিজস্ব বায়োলজি ইনস্টিটিউটে এই বিষ উৎপন্ন ও উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। এই বিষের কয়েকটি ফোটা যদি কারো শরীরে ছিটিয়ে দেয়া হয় তবে তা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই বিষ প্রয়োগ করা হলে তার প্রমাণ বের করা কঠিন, এমনকী ময়না তদন্তেও তা প্রমাণিত হবে না। এরকম বিষ অতীতে মোসাদ ব্যবহার করেছে। সেই বিষের শিকার হলেন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের নেতা হাদাদ।

ইসরাইলি সাংবাদিক রোনেন কয়েক বছর পরে মোসাদের কর্মকর্তা মিশাখি বেন ডেভিডকে প্রশ্ন করেছিলেন, এ ধরনের বিষপ্রয়োগ তাকে ব্যথিত করে না? এটাতো অমানবিক মৃত্যু।

ডেভিড ঐ সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলেন, কারো মাথায় গুলি করলে কিম্বা কারো গাড়িতে ক্ষেপনাস্ত্র ছুড়ে মারলে সে মৃত্যু কী মানবিক হয়? সর্বোচ্চ ভাল হয় মানুষকে না মারার যদি প্রয়োজন না হয়, মানুষকে যদি না মারা হয়। কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে এ ধরনের মৃত্যু অবধারিত।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কোন হইচই ছাড়াই খালেদ মাশালকে মেরে ফেলা সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই যৌক্তিক।

১৯৯৭ সালের গ্রীষ্মকালে তেলআবিবের পথচারীরা দেখল যে, দু'জন লোক রাস্তায় বসে কোকাকোলার ক্যান ঝাকাচ্ছে। এক পর্যায়ে ট্যাব খুলে ফেলছে। লোকজন এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে চলেও যাচ্ছে। কিন্তু পথচারীদের কেউই আন্দাজ করতে পারেনি যে, এরা মোসাদের লোক। খালেদ মাশালকে হত্যার মহড়া দিচ্ছিল তারা। মহড়াটি হল একজন কোকের ক্যান খুলে টার্গেটের মনোযোগ ডাইভার্ট করবে আরেকজন ইত্যবসরে তার ঘাড়ের পেছনে কয়েক ফোটা বিষ ঢেলে দেবে।

১৯৭৭ সালের আগস্টে খালেদ মাশালকে হত্যার অভিযানের ছয় সপ্তাহ আগে প্রথম আততায়ী জর্ডানে গিয়ে পৌঁছায়। সে বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে আসে এবং খালেদ মাশাল প্রতিদিন কী কী কাজ করেন তা নিরীক্ষা করবে। যেমন মাশাল সাধারণত কখন বাসা থেকে বের হন, তার গাড়ি চালায় কে, তার গাড়িতে কে কে থাকে, তার যাতায়াতের রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থা কেমন থাকে ইত্যাদি। খালেদ মিশাল গাড়ি থেকে নেমে যে ভবনে যান, তার দূরত্ব পথে যদি কারো সাথে কথা বলেন সেই সময়ের পরিমাপসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহই তার কাজ।

এই অগ্রিম দল কিডোন সদর দফতরে এসব নিয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠায়। এই প্রতিবেদনে লেখা হয় প্রতিদিন সকালে খালেদ মাশাল কোন দেহরক্ষী ছাড়াই বাড়ি থেকে বের হন। তার গাড়িটি চালায় একজন সহকারী এবং মাশাল প্রতিদিন আম্মানে ফিলিস্তিন রিলিফ ব্যুরোতে যান। মাশাল নেমে গেলে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার চলে যায়। সামান্য পথ মাশাল হেঁটে গিয়ে ঐ ভবনে প্রবেশ করেন। রিলিফ ব্যুরো ভবনটি জর্ডানের রাজধানীতে মূলত হামাসের সদর দফতর। অগ্রগামী দল তাদের রিপোর্টে আরও জানায় যে, সবচে ভাল হয় যদি খালেদ মাশালকে সকালের দিকে হত্যা করা হয়। তিনি গাড়ি থেকে নেমে ব্যুরো বা ভবন পর্যন্ত যাওয়ার মাঝেই তাকে হত্যা করা সম্ভব।

পুরো গ্রীষ্মকাল ধরেই খালেদ মাশালকে হত্যার পূর্ব পরিকল্পনা করতে থাকে আগাম দল। সহায়তাকারী দলও আম্মানে আসতে শুরু করেছে। তাদের জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়া হল, গাড়ি ঠিক হল। কিন্তু হঠাৎ করেই ৪ সেপ্টেম্বর জেরুজালেমে সন্ত্রাসী হামলা হয়। হামাস আত্মঘাতীর হামলায় পাঁচ ইসরাইলী নিহত এবং ১৮১জন আহত হন। ফলে ইসরাইলের পক্ষে আর অপেক্ষা করার সময় নেই। তাদেরকে এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টার্গেটে।

১৯৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, অভিযানের আগের দিনটি। আম্মানের বিশাল একটি হোটেলের সুইমিং পুলে বেশ কয়েকজন ট্যুরিস্ট। একজন লোক হোটেল কর্মচারীদের জানান যে, তার হার্ট অ্যাটক হয়েছিল। সেই অসুখ থেকে তিনি সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছেন। তার চলাফেরা হাঁটার ভঙ্গি দেখলে মনে হয় এখনো তিনি অসুস্থ। এ কারণে তার সাথে সাথে সার্বক্ষনিকভাবে একজন মহিলা ডাক্তার রয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে মহিলা ডাক্তারটি তার রক্তচাপ ও পালস পরীক্ষা

করছে। এই হৃদরোগী হল মিশাখা বেন ডেভিড। ডেভিডের কাজটা হল মোসাদের সদর দফতর এবং মাঠে নেমে পড়া গোয়েন্দাদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা। দলের মহিলাটি প্রকৃতই একজন ডাক্তার। এই ডাক্তার সব সময় তার কাছে একটি ইনজেকশন রাখে। এটি একটি এন্টিডট ইনজেকশন। ইন্টিডট ইনজেকশন এ কারণে যে, কোন মোসাদ এজেন্টের শরীরে মাশালকে ছোঁড়ার সময় যদি বিষ গায়ে লাগে তাহলে এন্টিডট ইনজেকশনের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে বিষমুক্ত করে সুস্থ করা যায়।

কথিত হৃদরোগী এবং মহিলা ডাক্তার সুইমিং পুলের কাছে অপেক্ষমাণ। হিট টিম তাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখে নিচ্ছে। গত কয়েকদিন আম্মানে মোসাদের বেশ কয়েকজন গোয়েন্দা এসেছে। ঘটনাস্থল থেকে এজেন্টদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়াসহ আরও কিছু কাজ তাদের উপর বর্তাবে। অবশেষে হিট টিমের দুই সদস্য যারা মোসাদের কিডোন ইউনিটের সদস্য তারা এল। তারা কানাডায় টুরিস্ট হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। একজনের নাম শান কেন্ডাল আরেকজন বেরী বেডস। তারা একটি আন্তর্জাতিক মানের হোটেলে উঠেছে। অবশ্য তাদের নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রথমত এদের দু'জনার কেউই কোন আরব দেশে কখনো অভিযান পরিচালনা করেনি। প্রশ্ন হল কেন তাদের কানাডার পাসপোর্ট ধরিয়ে দেয়া হল। যদি কখনো প্রমাণিত হয় তারা কানাডার নাগরিক নয় তখন কী হবে। তাদের ইংরেজীও অত চৌকষ নয়। তাদের উচ্চারণ ইসরাইলীদের মত।

খালেদ মাশালকে হিট করা হবে তার অফিসে ঢোকার মুহূর্তে। শান ও বেরীর সঙ্গে মাশালের বিতন্ডা খুব বেশী সময় ধরে হওয়ার কথা নয়। শান এবং বেরী এগিয়ে যাবে মাশালের দিকে এবং মাশালের প্রতি স্প্রে ছুঁড়বে। সেই তরল স্প্রে। খুব কাছাকাছি গাড়ি প্রস্তুত থাকবে এবং মাশালের গলায় স্প্রে করেই তারা গাড়িতে উঠে পালাবে। উল্লেখিত দুই কানাডীয় নাগরিক তা প্রাকটিস করেছে। শান কোকের ক্যান ধরে রাখবে এবং যখন মাশাল ফিরে তাকাবে তখন মাশালের শরীরে স্প্রে করবে। কাজটা যে তারা দুর্ঘটনা বশত করে ফেলেছে এমন একটা ভাব করবে। মাশাল মারা গেলে বলা হবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এই ছিল খালেদ মাশালকে হত্যার পরিকল্পনা।

ওদিকে পর্যটকের বেশে একজন পুরুষ ও এক মহিলা ঐ সময় ঐ ভবনেই থাকবে। হিট টিমকে সাহায্য করতে হলে তারা এগিয়ে আসবে। ধরা যাক মাশাল খুব দ্রুত অফিস ভবনের দিকে যাচ্ছেন। এবং উল্লেখিত দুই কানাডীয় তাকে হয়ত ধরতে পারল না। সেক্ষেত্রে ঐ দুই পর্যটক মাশালকে দুম করে আঘাত করে মাশালের যাত্রাকে বিলম্বিত করবে। ইত্যবসারে হিট টিম এসে মাশালের শরীরে বিষ স্প্রে করবে। মোসাদ এরকম হাল্কা চালে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে জর্ডান। কেননা জর্ডানের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নেয়া যাবে না।



খালেদ মাশাল

মাশালকে হত্যায় আট গোয়েন্দাকে জর্ডানে পাঠানো হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয়, ঘটনাস্থলে যদি অনেক লোকের সমাগম ঘটে, হামাস যোদ্ধা ও মিলিটারীর সংখ্যাধিক্য দেখা যায় কিম্বা আত্মীয় স্বজনদের আগমন ঘটে তাহলে অভিযান যেন পিছিয়ে দেয়া হয়। অন্য কোন সময় খালেদ মাশালকে হত্যা করা যাবে।

১৯৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর অভিযানের কমান্ডার মাশালের অফিসের সামনের রাস্তায় পজিশন নিয়ে নেয়। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল মোবাইল ফোন জাতীয়

কিছু ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে বডি ল্যাংগুয়েজের মাধ্যমে বা আভাসে ইংগিতে কাজ চালাতে হবে। কমান্ডার একটা বিশেষ ক্যাপ পরে থাকবেন। যদি অভিযান বাতিল হয় কমান্ডার তার ক্যাপ খুলে ফেলবেন।

ভবনের পেছনে রয়েছে দুই হিট ম্যানের সটকে পড়ার জন্য গাড়ি। শান এবং বেরী মূল কাজের জন্য তৈরি। সব কিছুই প্রস্তুত।

প্রতিদিন যে রুটিন মাশাল মেনে চলেন সে ভাবেই ঐ দিন সবকিছু এগুচ্ছিল। হঠাৎ মাশাল পত্নী তার দুই সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিতে বলেন তার স্বামীকে। মাশাল প্রায়শই এটা করে থাকেন। দুই শিশু তার বাবার গাড়িতে উঠে বসল। বাবাও সাথে। কিন্তু মোসাদের সার্ভিলেন্স টিম ঐ দুই শিশুকে দেখেনি। বরং গোয়েন্দারা বসদের জানাল মাশাল একাই অফিসে যাচ্ছেন।

বাচ্চারা বসেছিল পেছনের সিটে। গাড়ির কাচ টিন্টেট করা। ফলে মোসাদ গোয়েন্দারা বাচ্চাদের দেখতে পায়নি।

মাশাল অফিসে এলেন এবং গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। তিনি যখন সিড়িতে উঠে প্রবেশপথের কাছাকাছি তখন দুই হিটম্যান তার দিকে এগিয়ে এল। তারা দশ মিটার থেকে পাঁচ, তিন মিটার কাছাকাছি এসে গেল মাশালের। এরি মধ্যে গাড়িতে অপেক্ষমাণ মাশালের ছোট মেয়ে বাবা বলে চীৎকার দিল এবং গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে বাবার দিকে এগুতে থাকল। ড্রাইভারও গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল এবং ছোট্ট মেয়েটির পেছনে পেছনে আসতে থাকল। কমান্ডার ক্যাপটি মাথা থেকে সরিয়ে অভিযান স্থগিত করতে বলল। কিন্তু সব কিছু খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল। হিট টিমের দুই সদস্য কমান্ডারের ইংগিত যেমন দেখেনি তেমনি ছোট্ট শিশু ও ড্রাইভারের এগিয়ে আসার ব্যাপারটিও তারা লক্ষ্য করেনি। তারা অবশ্য একটা থামের পেছনে ছিল।

দুই হিট ম্যান তাদের অভিযানে ব্যস্ত। তারা মাশালের খুব কাছে। শান কোকের বোতল প্রশিক্ষণ মত ঝাকাল। অন্যদিন ট্যাবটা খুলে যায়। কিন্তু আজ সেটি খুলল না। হিট টিমের আরেক সদস্য বেরী মাশালকে স্প্রে করার জন্য হাত তুলল। এদিকে মাশালের ড্রাইভার মনে করল তার বসকে ছুরি মারা হচ্ছে। মাশাল তার ড্রাইভারের চীৎকার শুনে ফিরে তাকালেন। ঠিক এই সময়

বেরী মাশালের কানে বিষ স্প্রে করল। হিট টিমের দু'জন বুঝল যে, সমস্যা একটা হবে। তারা সটকে অফিসের পেছনে অপেক্ষমাণ গাড়িতে গিয়ে উঠল।

এমন সময়ে ঘটনাস্থলে আরেকটি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটল। সেইফ একজন হামাস যোদ্ধা। তিনি মাশালের কাছে কিছু কাগজপত্র পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি চীৎকার শুনতে পান এবং দু'জন লোক তার বসকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করছে দেখতে পান। মাশাল তার জীবন রক্ষার্থে দৌড়াচ্ছিলেন। আবু সেইফ তখন শান ও বেরীকে আটকের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে তারা গাড়ির কাছে চলে গেছে। সেইফ শানের সাথে ধস্তাধস্তি করছিলেন। শান কোকের ক্যান দিয়ে সেইফকে আঘাত করছিল। শান ও বেরী লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠতে সক্ষম হয়। গাড়ি এগিয়ে চলে।



খালেদ মাশাল পত্নী অমল বুরুনি

গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভার জানায় যে, সেইফকে গাড়ির নাম্বার লিখতে দেখেছে। হিট ম্যান তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয় গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার। তাদের আশংকা ছিল আবু সেইফ পুলিশকে সতর্ক করতে পারে। এখন তারা যদি পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী গাড়ি নিয়ে হোটেলে যায় তাহলে গ্রেফতার হতে পারে। সেইফ হাউজের ঠিকানাও তাদের জানা নেই। সেক্ষেত্রে পালানোর আর কোন পথ নেই। কিছু দূর গিয়ে শান এবং বেরী গাড়ি থেকে নেমে যায়। ড্রাইবার দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়।

আবু সেইফ ঠিকই ওদের পেছনে পড়ে রইলেন। সেইফ আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। একজন বিশিষ্ট মুজাহীদিন। দুই হিটম্যান রাস্তার দুই পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। ফোনে কোন সতর্কতা না দিয়েই সেইফ বেরীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তার শার্ট ধরে ফেলে। শান ছিল রাস্তার অপর পাশে। সে তার সহকর্মীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। সে আবু সেইফকে মারতে থাকে। তাতে সেইফ তার মাথায় আঘাত পান। এই ধস্তাধস্তির সময় লোকজন রাস্তায় জমে যায়। কেননা দুই বিদেশি এক আরবকে মারধর করছে। এক পুলিশ অফিসার ভিড় সরিয়ে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তিনজনকেই থানায় নিয়ে যায়। এদিকে আবু সেইফ আবার মারাত্মক আহত।



বাদশাহ হোসেন

থানায় পুলিশ মনে করেন, আবু সেইফ দুই বিদেশিকে আক্রমণ করেছে। আবু সেইফ জানান, এই দুই বিদেশী মাশালকে আক্রমণ করেছিল। জর্ডান কর্তৃপক্ষ দুই বিদেশির পাসপোর্ট দেখে বুঝতে পারে যে, এরা কানাডার নাগরিক। তারা কানাডার কনসালকে বিষয়টি অবহিত করে। কানাডার কনসাল বেরীর সাথে সামান্য কয়েকটি কথা বলে। অতঃপর কনসালের কর্মকর্তা জর্ডান পুলিশকে জানায়, তারা কানাডার নাগরিক নয়।

জর্ডান পুলিশ মহাবিপদে। তারা দুই বিদেশিকে গারদে ঢুকায় এবং একটি মাত্র ফোন করার সুযোগ দেয়। দুই হিট ম্যান ইউরোপে তাদের অপারেশনাল সদর দফতরে ফোন করে তাদের গ্রেফতারের কথা জানায়। একই সময় এক নারী মোসাদ সদস্যা যে অভিযান অংশ নিয়েছিল সে তাদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখিত হৃদরোগী মিশকা ডেভিডকে জানায়। এই নারী মাশালের অফিসের কাছে ওয়াচার হিসেবে নিয়োজিত ছিল। ডেভিড দ্রুত হোটেলে চলে যায়। ডেভিড তার কাছাকাছি কোন মোসাদ সদস্যকে আসতে নিষেধ করে এবং সকলকে জর্ডান ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ডেভিড তার দড়ি খুলে ফেলে এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে মিটিং করার কথা সেখানে চলে যায়। এরি মধ্যে অপারেশনের কমান্ডার আসে এবং অভিযান যে ব্যর্থ হয়েছে তারও তার জানা।

ডেভিড মোসাদকে তাৎক্ষনিকভাবে একটা রিপোর্ট পাঠায়। মোসাদ প্রধান জেনারেল ইয়াতেম সবার সঙ্গে বৈঠক করে গোয়েন্দাদের ইসরাইলী দূতাবাসে শরনার্থী হিসেবে ঢোকার নির্দেশ দেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যে পথে তাদের পালানোর কথা ছিল এবং মহড়াও দিয়েছে সেই পথ ব্যবহার না করার জন্য বলা হয়। জর্ডানে ফিরে সকলে মিটিং প্লেস ছেড়ে যায় এবং দূতাবাসে চলে যায়। সেই নারী মোসাদ সদস্য যে ডাক্তারও – সে একমাত্র হোটেলে থেকে যায়।

এদিকে বিষ প্রয়োগের ফলে খালেদ মাশালের অবস্থা মর মর। তাকে হাসপাতালের নেয়া হয়। ইসরাইল উপলব্ধি করে যদি এন্টিডোট দেয়া না হয় তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মাশাল মারা যাবেন। গাড়িতে বসেই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এই দুঃসংবাদটি পান। নেতানিয়াহু যাচ্ছিলেন ইহুদীদের নববর্ষের এক অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি মোসাদ অফিসের কাছেই। জেনারেল

ইয়াতোম প্রধানমন্ত্রীকে পুরো বিষয়টি অবহিত করেন। মোসাদ প্রধান জেনারেল ইয়াতোমকে তিনি অবিলম্বে আম্মান যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে তার কাজটা হল বাদশাহ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং যা যা ঘটেছে তার সত্যিটা বলা। একবর্ণও যেন মিথ্যা বলা না হয়। মোসাদ অফিসে বসেই নেতানিয়াহু বাদশাহ হোসেনকে ফোন করেন এবং মোসাদ প্রধানকে তার কাছে পাঠাচ্ছেন বলে জানান। বিষয়টা অতীব জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। বাদশাহ রাজি হন। বাদশাহের অবশ্য কোন ধারণা ছিল না মোসাদ প্রধান তার সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলবেন।

নেতানিয়াহুর কয়েকজন উপদেষ্টা এ সময় তার সঙ্গেই ছিলেন। তারা নেতানিয়াহুকে পরামর্শ দেন, ইসরাইলী গোয়েন্দাদের ফেরত আনতে বাদশাহ হোসেন যা যা চাইবেন সবই যেন দেয়া হয়। এ ব্যাপারে মোসাদ প্রধানকে নির্দেশ দেয়া হয়। নেতানিয়াহু মোসাদ প্রধানকে বলেন, তিনি যেন এন্টিডোটের ব্যাপারে জর্ডানের সঙ্গে কথা বলেন। এন্টিডোট ইনজেকশন না দিলে মাশালকে কোন মতেই বাঁচানো যাবে না।

শ্যারন পরবর্তীতে বলেছেন, মাশালের ঘটনায় নেতানিয়াহু বারবার ভেঙ্গে পড়ছিলেন। আমরাই তাকে ক্ষনে ক্ষনে তাজা রাখছিলাম। এবং এই ঘটনায় নেতানিয়াহু যে কোন প্রকার সমঝোতায় আগ্রহী ছিলেন।

মোসাদ প্রধানের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে বাদশাহ হোসেন তার লোকদের মাশালের অবস্থা জানার জন্য বললেন। কিন্তু বাস্তবতা হল মাশালের অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। বাদশাহ অবিলম্বে তাকে রাজকীয় হাসপাতালে ভর্তি করার নির্দেশ দিলেন। এদিকে এন্টিডোট দিয়ে মাশাল ভাল হয়ে যাবেন। বাদশাহ তাতে রাজি হলেন। বিষয়টি মজার এই কারণে যে, ইসরাইল তার জাতশত্রুকে বাঁচাতে ব্যস্ত এবং এনিয়ে জর্ডানের সাথে পাল্লা দিচ্ছে।

মিশকা ডেভিড হোটেলে ফিরেছেন। এন্টিডোট ইনজেকশন তার পকেটে। ইসরাইলী সাংবাদিক রোনেন বার্গম্যানের সঙ্গে পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমি এন্টিডোট পকেটে নিয়ে ঘুরেছি। আমাদের কোন গোয়েন্দার আর এন্ডিডোট প্রয়োজন নেই কেননা স্প্রে তাদের শরীরে লাগেনি।

একমাত্র আমাদের টার্গেট মাশালই আহত হয়ে এখন মরনাপন্ন। ডেভিড বলেছেন, এক পর্যায়ে আমি এন্টিডোট ইনজেকশন ধ্বংস করতে চেয়েছিলাম। কেননা এটিসহ ধরা পড়লে আমার খবর আছে।

এ সময় ডেভিড ইসরাইল থেকে তার ইউনিট কমান্ডারের ফোন পান। এন্টিডোটটি আছে কী না তা তিনি জানতে চান। হ্যাঁ বললে তিনি আমাকে হোটেল লবিতে এক্ষুনি চলে যেতে বলেন। জর্ডান আর্মির এক ক্যাপ্টেন সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্যাপ্টেন এন্টিডোটটি নিয়ে হাসপাতালে চলে যায়। ঠিক এ সময় আরেকটি সমস্যার উদয় হয়। আর সমস্যার মূলে মোসাদের সেই নারী ডাক্তার। কথা ছিল এই নারী ডাক্তারই মৃত্যুমুখে পতিত খালেদ মাশালকে এন্টিডোট ইঞ্জেকশনটি পুশ করবে। কিন্তু মেয়েটি বলে, মোসাদ প্রধানের নির্দেশ ছাড়া সে ইনজেকশন দেবে না। এবং তাকে সরাসরি এ নির্দেশ দিতে হবে। জেনারেল ইয়াতোম রাজপ্রাসাদ থেকে তাদের দূতাবাসের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি নারী ডাক্তারকে ফোন করে মাশালের কাছে যেতে বললেন। কিন্তু ওরা আসল ঠিকই কিন্তু জর্ডানের ডাক্তাররা বেঁকে বসলেন। তারা কিছুতেই ইসরাইলি ডাক্তার দিয়ে মাশালকে এন্টিডোট ইনজেকশন দিতে দেবে না। বরং জর্ডানের ডাক্তারদের আশংকা হল, ইসরাইলীরা হয়ত ইনজেকশন দিয়ে মাশালকে হত্যা করে তাদের অভিযানের সমাপ্তি ঘটাবে।

এই বিতর্ক ও জটিলতার মধ্যে আরেক সমস্যা সৃষ্টি করলেন বাদশাহ হোসেনের চিকিৎসক। মাশালের জীবন বাঁচানোর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এন্টিডোটের রাসায়নিক ফর্মূলা এবং যে বিষ দিয়ে মাশালকে ঘায়েল করা হয়েছে তা না জানা পর্যন্ত তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। নতুন এই সংকটে উভয় পক্ষই অনঢ়। জর্ডান ফর্মূলা চাইছে ইসরাইল ঘোরতর আপত্তি করে চলেছে।

খালেদ মাশালের অবস্থার আরও দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। তার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে কৃত্রিম উপায়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছিল। রাজকীয় হাসপাতালে মাশালের শয্যাপাশে উপস্থিত সকলেরই আশংকা মাশালকে বাঁচানো যাবে না। আবার মাশাল মারা গেলে জর্ডান ও ইসরাইলের ভঙ্গুর সম্পর্ক আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। বাদশাহ হোসেন ইসরাইলের আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তার সেনাবাহিনীকে ইসরাইলের দূতাবাস ভেঙ্গে সেখানে অবস্থানরত মোসাদ

গোয়েন্দাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেবেন বলেও হুমকি দিলেন। ইসরাইলের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার ইতি টানবেন বলেও ঘোষণা দিলেন।

এভাবে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হল। বাদশাহ বললেন, মাশাল মারা গেলে তিনি ইসরাইলী গোয়েন্দাদের ফাঁসিতে ঝুলাবেন। উল্লেখ্য ইসরাইলের দুই এজেন্ট রয়েছে পুলিশের জিম্মায় এবং ৪ জন দুতাবাসে আশ্রয় নিয়েছে। বাদশাহ হোসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে জরুরী ভিত্তিতে ফোন করেন।

আমেরিকা এবার ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করল। আমেরিকা এন্টিডোটসহ দুই ইনজেকশনের ফর্মূলা জর্ডানকে দিতে বলল। নেতানিয়াহু মন্ত্রীসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে অবশেষে জর্ডানকে ফর্মূলা দিতে রাজি হলেন।

জর্ডানের ডাক্তার মাশালকে এন্টিডোট ইনজেকশন পুশ করতেই অবিলম্বে মাশাল চোখ খুললেন। মাশালের বেঁচে যাওয়ার খবরে ইসরাইলে উল্লাস দেখা গেল। ভাবখানা এরকম, তাদের কোন স্বজন যেন বেঁচে গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সেই কথিত হৃদরোগী ডেভিড ও নারী ডাক্তারকে জর্ডান ত্যাগের অনুমতি দেয়া হল। আম্মানে বন্দী হয়ে থাকল ইসলাইলের ছয় গোয়েন্দা।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে মাশালের স্বাস্থ্য দ্রুত ভাল হতে লাগল। ইসরাইল একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল জর্ডানে পাঠাল। প্রতিনিধি দলে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যারন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মরডেটি প্রমুখ ছিলেন। বাদশাহ এই প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং তার ভাই হাসানকে পাঠালেন তাদের সাথে কথা বলতে।

ইসরাইলী মন্ত্রিসভা বাদশাহর ব্যক্তিগত বন্ধু একরাইম হ্যালেভীকে ব্রাসেলস থেকে ডেকে পাঠালেন। হালেভী এক সময় মোসাদের দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং বর্তমানে ইইউকে রাস্ট্রদূত। তিনি দ্রুত আম্মানে চলে এলেন এবং বাদশাহকে একটা ডিল অফার করলেন। হ্যালেভী বাদশাহকে বললেন, আপনারা যদি

ইসরাইলের চার সেনাকে ছেড়ে দেন আমরা তার বিনিময়ে হামাসের ক্যারিশমেটিক নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিনকে ছেড়ে দেব। বাদশাহ রাজি হলেন। ইসরাইলের চার মোসাদ গোয়েন্দা হালেভীর সঙ্গে দেশে ফিরল।

জর্ডানের সাথে চূড়ান্ত আলোচনার দায়িত্ব দেয়া হল পররাষ্ট্রপমন্ত্রী শ্যারনের ওপর। তিনি বাদশাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে আসছিলেন।
শ্যারেনের প্রথম দাবি আম্মানের জেলের দুই মোসাদ এজেন্টকে মুক্তি দিতে হবে। এর বিনিময়ে ইসরাইলের জেলে আটক ২০ বন্দীকে মুক্তি দিতে শ্যারন রাজি হন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জর্ডান পক্ষ তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে এবং ইসরাইলের কাছ থেকে আরও নানা সুবিধা চায়। বাদশাহর সামনেই শ্যারন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ক্রোধান্বিত ভাষায়, শ্যারন বলেন, আমাদের লোকদের মুক্তি চাই না। ওরা আপনাদের জেলেই থাকুক। আপনারা যদি আমাদের উপর একটার পর একটা দাবি চাপাতেই থাকেন, আমরা আপনাদের পানি বন্ধ করে দেব। উল্লেখ্য, ইসরাইল থেকে জর্ডানে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

শ্যারনের ক্ষোভ প্রকাশে কাজ হল। ডিল নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘটল। ইসরাইলী ২টি হেলিকপ্টার জর্ডানে নামল। দুই মোসাদ সদস্য ইসরাইল ফিরে গেল, আরেকটি হেলিকপ্টারে শেখ ইয়াসিন তার দেশ জর্ডানে ফিরে এলেন।

স্বদেশে এবং বিদেশে জর্ডানে ইসরাইলী হামলার তীব্র সমালোচনা হল। নেতানিয়াহু মাশাল নিধন উদ্যোগে আক্রমনের শিকার হলেন। অনন্যোপায় হয়ে নেতানিয়াহু জর্ডান অভিযানের ব্যর্থতা অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটির করলেন।

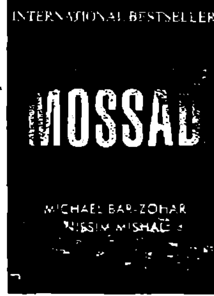
তদন্ত কমিটি নেতানিয়াহুর কোন দোষ পেল না। কিম্বা মোসাদ প্রধানকে এ ধরনের একটি ত্রুটিপূর্ণ অভিযান পরিচালনার জন্য দোষারোপ করা হল। তদন্ত কমিটি অবশ্য মোসাদ প্রধান ইয়াতোমের পদত্যাগ দাবি করেনি।

আম্মানের কলঙ্কজনক ঘটনায় জর্ডানের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক আরও খারাপ হল। খালেদ মাশাল হামাসের বড় কোন নেতা নন কিন্তু হত্যা চেষ্টার ঘটনার মাধ্যমে তিনি দলে বেশ মর্যাদা পেয়ে যান এবং বর্তমানে তিনি একজন শীর্ষ নেতা। শেখ ইয়াসিনের মৃত্যুর পর হামাসের একেবারে শীর্ষ নেতায় পরিণত হন খালেদ মাশাল।

মোসাদ প্রধান জেনারেল ইয়াতোম অভিযানের শুরু থেকেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে তুলোধুনা করেন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র কর্মকর্তারা। মোসাদের দ্বিতীয় ব্যক্তি আলীজা মাগেল ইয়াতোম মোসাদ প্রধান হওয়ার যোগ্য নন বলে সরাসরি অভিযোগ তোলেন।

এতদসত্ত্বেও ইয়াতোম পদত্যাগ করলেন না। পদত্যাগ করলেন আরেকটি গোয়েন্দা সংস্থা কায়সারেয়াও প্রধান। অবশ্য পাঁচ মাস পরে ইয়তোম পদত্যাগ করেন। সুইজারল্যান্ডে এক মোসাদ সদস্য গ্রেফতার হন। এক হিজবুল্লাহ নেতার ফোন ট্যাপ করার অভিযোগে এই গ্রেফতার। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে এই ঘটনায় দায়িত্ব নিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন।

ইয়াতোমের স্থালভিষিক্ত হলেন হালেভী। তিনি এক সময় মোসাদের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। উল্লেখ্য মাশালের ঘটনায় আটক ইসরাইলের চার মোসাদ গোয়েন্দাকে ছাড়িয়ে আনতে তিনি জর্ডানের বাদশাহের সাহায্য নিয়েছিলেন।



ডাবল এজেন্ট ও ক্রুশ্চেভের ভাষণ

শুরুটা হয়েছিল ভালবাসা দিয়ে। ঘটনার সময় ১৯৫৬। লুসিয়া বারানোভস্কি প্রেমে হাবুডুবু ভিক্টর গ্রায়েভস্কি নামের এক সুদর্শন সংবাদিকের। তার বিয়ে ঠিক কম্যুনিস্ট শাসিত পোল্যান্ডের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু তাদের দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। লুসিয়া পোলিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদিকা। তার কর্মচারীরা ভিক্টরের এই অফিসে প্রায়শই আসা যাওয়ার কারণে কিছুটা আপন ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এদিকে লুসিয়া সাংবাদিক ভিক্টরকে যে ভালবাসে তা নিয়ে কোন রাগ ঢাক নেই।

পোলিশ নিউন এজেন্সীতে ভিক্টর সিনিয়র এডিটর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বিষয়াদি সে দেখাশোনা করে। ভিক্টর মূলত ইহুদী এবং তার প্রকৃত নাম ভিক্টর শাকিলম্যান। কিন্তু বছর খানেক আগে সে নাম পাল্টেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের সময় সে তার নাম পাল্টায়। তার এক বন্ধু তাকে বলেছিল শাকিলম্যান নাম নিয়ে পোল্যান্ডে বেশী দূর এগোনো যাবে না। ফলে পরবর্তিত হয়ে নাম হল ভিক্টর গ্রায়েভস্কি। এখন নামটা পোলিশ পোলিশ মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনাবাহিনী পোল্যান্ড দখলের সময় ভিক্টর ছিল শিশু। তার পরিবার এ সময় রাশিয়া ক্রস করে এবং অল্পের জন্য হলকস্ট এড়াতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের পর আবার তারা পোল্যান্ড ফিরে আসে। ১৯৪৯ সালে ভিক্টরের বাবা মা ও ছোট বোন ইসরাইলে চলে যায়। কিন্তু কম্যুনিজমে মগ্ন ভিক্টর থেকে যায়। সে আবার স্টালিনের বেজায় ভক্ত। তার ইচ্ছা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য মাটির পৃথিবীতে সে স্বর্গ বানাবে।

কিন্তু ভিক্টরের কলিগ, বন্ধুরা এমনকী তার প্রিয়তমাও জানত না যে, ভিক্টরের মধ্যে এক ধরণের ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ভিক্টর ইসরাইলে তার পরিবারের কাছে গিয়েছিল। এখানে সে পৃথিবীর অন্য একটি রূপ দেখতে পেল। ইসরাইলের সমাজ মুক্ত, প্রগতিশীল। ইহুদীদের এযেন একটা গণতান্ত্রিক জাতি। কম্যুনিস্ট প্রচারণা চালাতে চালাতে ভিক্টর ক্লান্ত। শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। পোল্যান্ড ফিরে ত্রিশ বছর বয়সী ভিক্টর ইসরাইলে স্থায়ী ভাবে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে থাকে।

১৯৫৬ সালে এপ্রিলে ভিক্টর যথারীতি তার সুইট হার্টের অফিসে (পার্টির সেক্রেটারী অফিস) আসে। তার ডেস্কে সে একটি লাল খামে টপ সিক্রেট লেখা একটা ফাইল দেখতে পায়। সে তার সুইট হার্টের কাছে ওটা কী জানতে চায়। সুইট হার্ট বলে, এটা ক্রুশ্চেভের ভাষণ। ভিক্টর পাথর হয়ে যায় যেন। সে ক্রুশ্চেভের ভাষণ সম্পর্কে শুনেছে। কিন্তু এমন একজন লোককে পায়নি যে ক্রুশ্চেভের ভাষণের একটি লাইন কোথায় পড়েছে কিম্বা ভাষনটি দেখেছে। কম্যুনিষ্ট ব্লক ভাষণটি অতিগোপনীয় হিসেবে গন্য করে। ফলে এটি দেখার বা শোনার কোনই সুযোগ নেই।



ভিক্টর গ্রেভস্কি

ভিক্টর সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। সে শুধু জানে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির মহাক্ষমতাধর এই মহাসচিব দলের ২০তম কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দিয়েছেন। ক্রেমলিনে ফেব্রুয়ারি মাসে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতের পর সকল বিদেশি মেহমান ও বিদেশি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধানদের হল থেকে বের করে দিয়ে মহাসচিব ক্রুশ্চেভ এই ভাষণ দেন। হলে তখন ১৪শত সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তার ভাষণ উপস্থিত সকলকে হতভম্ব ও আবেগাপ্লুত করে তোলে। চার ঘন্টা ভাষণ দেন ক্রুশ্চেভ। ভাষণে কী বলেছেন ক্রুশ্চেভ! পশ্চিমে প্রেরিত এক মার্কিন সাংবাদিকের রিপোর্টে বলা হয়, যে সব সোভিয়েত নেতাদের রুশবাসি পুজা করে তারা কী ধরনের পাপাচার ও দুর্নীতি করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়েছেন ক্রুশ্চেভ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার দায়ে তিনি পূর্বসুরী নেতা স্টালিনকে তুলোধুনা করেন। তার ভাষণের সময় চারদিকে কিছু কানাঘুষা ও বিস্ময় প্রকাশিত হলেও অনেককে কাঁদতে দেখা যায়। ভাষণকালে অনেককে চুল ছিঁড়তে দেখা যায় এবং কেউ কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরের দিন কয়েকজন আত্মহত্যা করেন।

বিস্ময়কর ঘটনা হল, ক্রুশ্চেভের ভাষণের একটি লাইনও সোভিয়েত পত্র পত্রিকায় ছাপা হল না। মস্কো জুড়ে এই ভাষণকে ঘিরে নানা গুজব গুঞ্জন চলতে থাকে। পার্টির শীর্ষ কমিটির বৈঠকে ভাষণের অংশবিশেষ অবশ্য আলোচিত হয়। কিন্তু ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার পুরো অংশ গার্ড দিয়ে রাখা হয়। বিদেশি এক সাংবাদিক ভিক্টরকে জানায় যে ক্রুশ্চেভের পুরো বক্তৃতায় কপি পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রগুলো হা পিত্যেশ করছে। এমনকী সিআইএ ঐ পুরো ভাষনটি পেতে ৫০লক্ষ ডলার পুরস্কার দিতেও রাজি। শীতল যুদ্ধের এই উত্তুঙ্গ মুহূর্তে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে ক্রুশ্চেভের এই ভাষণটা পাওয়া খুবই জরুরী। পশ্চিমাদের বিশ্বাস, ক্রুশ্চেভের এই ভাষণ কম্যুনিষ্ট দেশ সমূহে ভূমিকম্প ঘটাবে এবং যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে তা সামাল দেয়া কঠিন হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্বের কমিউনিষ্ট দেশের কোটি কোটি বামপন্থী অন্ধের মত স্ট্যালিনের পূজা করে। ক্রুশ্চেভ তার ভাষণেও তার অপরাধের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তা তার ভক্তদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে।

ফলশ্রুতিতে এক কথায় বলতে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গেও যেতে পারে।

কিন্তু ক্রুশ্চেভের ভাষণের কপি পাওয়া ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল।
পরবর্তীতে ভিক্টর জানতে পারল, ক্রুশ্চেভ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার ভাষণের কিছু কপি তিনি পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট নেতাদের কাছে পাঠাবেন। সেই পাঠানো কপির একটি কপিই ভিক্টরের গার্ল ফ্রেন্ডের টেবিলে টপ সিক্রেট লিখে জমা পড়েছে।

ভিক্টর তার গার্লফ্রেন্ড ও পোল্যান্ড কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল লুসিয়ার কাছে দেখে তা কয়েক ঘন্টার জন্য ধার চাইল। বলল, এখানে গ্যাঞ্জামের মধ্যে পড়া যাবে না। বাসায় গিয়ে পড়বে। ভিক্টরকে অবাক করে দিয়ে লুসিয়া তাকে ভাষণের কপিটি দিল এবং ফেরৎ দেয়ার একটা সময় বেধে দিল। লুসিয়া বলল, তুমি এটা নিতে পার কিন্তু অবশ্যই তোমাকে অতটার মধ্যে ফেরত দিতে হবে। এটা আমি তালাবদ্ধ করে রাখব। আসলে লুসিয়া সব সময়ই ভিক্টরকে খুশি রাখতে চায়। এবারও তাই চাইল।

বাড়িতে এসে ভিক্টর ভাষণটি পড়ল। ভাষণটি রীতিমত বিস্ময়কর। ভাষণে ক্রুশ্চেভ নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে স্ট্যালিনের সমালোচনা করেছেন। এই ভাষণের মাধ্যমে স্ট্যালিনের ইমেজ খান খান হয়ে পড়ে যাবে। ক্রুশ্চেভ বলেন, স্ট্যালিন ক্ষমতায় থাকাকালে দৈত্যের মত আবির্ভূত হয়েছিলেন, হেন অপকর্ম নেই করেননি, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন। তিনি বলেন, বলশেভিক আন্দোলনের জনক লেনিন পার্টিকে স্ট্যালিনের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনকে সান অব দ্য ন্যাশন' হিসেবে অভিহিত করার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, স্ট্যালিন এক ভূয়া লোক এবং তাকে যেভাবে মহান হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে তা দুঃখজনক। তিনি তার ভাষণে আরও বলেন, স্ট্যালিনের শাসনামলে (১৯৩৬-১৯৩৭) ১৫ লক্ষ কম্যুনিষ্টকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৬লক্ষ ৮০ হাজার জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে শরীক হওয়া ১৯৬৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে স্ট্যালিনের নির্দেশে ৮৪৮জনকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩৮ প্রার্থীর মধ্যে ৯৮জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। ক্রুশ্চেভ ডক্টরস প্লট নিয়েও কথা বলেন। এই চক্রান্তের জন্য কয়েকজন ইহুদী ডাক্তারকে দোষারোপের নিন্দা

করেন তিনি। বলা হয়ে থাকে স্ট্যালিন এবং কয়েকজন সোভিয়েত নেতাকে হত্যার পেছনে ডাক্তারদের এই দলটি দায়ী। ক্রুশ্চেভ তার ভাষণে স্ট্যালিনকে গণহত্যাকারী হিসেবে অভিহিত করে বলেন, লক্ষ লক্ষ রুশ ও অপরাপর জাতি গোষ্ঠীর মানুষ স্ট্যালিনের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার। এদের মধ্যে অনেকেই কম্যুনিষ্ট ভাবধারার প্রতি অনুগত ছিলেন।

ক্রুশ্চেভের ভাষণ সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভিক্টরের যে মোহ ছিল সেই ধারণা খান খান করে ভেঙ্গে দিল। ভিক্টর বুঝে গেল ভাষণের এই কপিটি একটা বিস্ফোরকের চেয়েও ভয়ংকর বেশী এবং এটি প্রকাশিত হলে সোভিয়েত ব্লকের মূল ভিত্তি ধরে টান পড়বে। সে লুসিয়াকে ভাষণের কপিটি ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু লুসিয়ার কাছে যাওয়ার আগে তার মনটা বেঁকে বসল। তার পা দু'খানা যেন অন্যত্র যেতে চাইছে। কেমন করে জানি ভিক্টর ইসরাইল দূতাবাসে ঢুকে পড়ল। সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইসরাইল দূতাবাসে ঢুকে পড়ল। গেটে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিল। কিন্তু কী করে জানি তারা ভিক্টরকে পথ ছেড়ে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিক্টরকে দেখা গেল দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী ইয়াকুব বারমোরের টেবিলে। তিনি আবার পোল্যান্ডে সাবাকের প্রতিনিধিও।



ক্রুশ্চেভ

ভিক্টর তার হাতে ক্রুশ্চেভের ভাষণের লাল খামটি তুলে দিল। ভিক্টরকে কয়েক মিনিট বসতে বললেন ইয়াকুব। ভাষণটি পেয়ে তার আত্মা ছাড়ার উপক্রম হয়েছে। ইয়াকুব এক ঘন্টা পর ফিরে এলেন। ভিক্টর বুঝল যে, ইয়াকুব পুরো ভাষণটি ফটোকপি করে রেখেছেন। কিন্তু এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করল না। ভিক্টর খামটি তুলে নিল এবং কোর্টের ভেতরে সেটি লুকিয়ে ফেললো। সে লুসিয়ার অফিসে যথাসময়েই ফিরে গেল এবং লুসিয়া সেটি সাবধানে তুলে রাখল। কেউই ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করল না কিম্বা ইসরাইলের দূতাবাসে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করল না।

১৯৫৬ সালের খুব সকালের দিকে সাবাক এর পরিচালক আমোস ম্যানোরের কক্ষে ঢুকলেন জেলিগ কাটজ। কাটজ ম্যানোরের একান্ত সচিব। একটি পুরনো আরবদের ভবনে সাবাক এর সদর দফতর। ম্যানোর কটাজকে জিজ্ঞেস করলেন পূর্ব ইউরোপ থেকে কিছু এসেছে কীনা। শুক্রবারের এটা একটা রুটিন প্রশ্ন। কেননা এদিন ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে করে সাবাক এজেন্টেদের নানা তথ্য ও চিঠিপত্র সুরক্ষিত অবস্থায় আসে। জেলিগ জানালেন কয়েক মিনিট আগে ওয়ারশ থেকে ক্রুশ্চেভের ভাষণের অংশ বিশেষ এসেছে। মানোর একথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন এবং এখুনি তা নিয়ে আসার জন্য বললেন।

ম্যানোর মাত্র কয়েক বছর হল ইসরাইলের ইমিগ্রেন্ট হয়েছেন। তার জন্ম রুমানিয়ায়। স্বচ্ছলই ছিলেন তারা। তাকে ইউটজে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে বাবা-মা, দুইবোন অর্থাৎ পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়। তাদের ক্যাম্প মুক্ত হয়ে গেলে তিনি বুখারেস্টে চলে যান। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনে ইহুদী শরনার্থীদের চোরাপথে সেখানে প্রেরণে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। যুদ্ধকালে তার পরিচিতি ছিল আমোস নামে। যদিও কাজ চালাতে তাকে বহু নাম ব্যবহার করতে হয়েছে। ইসরাইলে যাওয়ার পালা যখন তার আসে রোমানিয়া তাতে আপত্তি জানায়। তিনি চেক প্রজাতন্ত্রের একটি ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে রুমানিয়া থেকে পালান। নিজের নাম ধারণ করেন অট্টো স্টানেক নামে। তার বন্ধুরা তার সহস্র নাম রয়েছে বলে মজা করতেন। ইসরাইলে ঢোকার পর তার নাম হয় আমোস ম্যানোর। ইসরাইলের গোয়েন্দা দফতরে তিনি অল্প সময়েই নাম করেন। ইসার তার প্রতি দুর্বল ছিলেন। কিন্তু ম্যানোর ছিলেন তার বিপরীত। ইসার ছোট খাট, ম্যানোর লম্বা। ইসার ছিলেন শান্ত। ইসার

খেলাধুলা করতেন না কিন্তু ম্যানোর ছিলেন ভাল সাঁতারু। টেনিস, ভলিবল খুব খেলতেন। ইসার মূলত রুশ ভাষায় কথা বলতেন, ম্যানোর জানতেন সাতটি ভাষা। ইসার লেবার পার্টির ভক্ত ও সদস্য কিন্তু ম্যানোর রাজনীতির ধার ধারতেন না। ইসার ভদ্রোচিত পোশাক পরতেন, ম্যানোর পরতেন ফ্যাশনেবল পোশাক। চেহারা ইউরোপীয়দের মত কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধিমান ছিলেন। ইসার তাকে ১৯৪৯ সালে সাবাকে নিয়োগ দেন। প্রায় চার বছরের মাথায় ইসারের অনুমোদনে প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ান তাকে পরিচালক করেন। ইসরাইলী গোয়েন্দাদের সিআইএর সাথে গোপন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

বৃষ্টিস্নাত এক শুক্রবারে ম্যানোর ফটোকপিগুলো নিয়ে নিজেই বসলেন। তার পক্ষে বোঝা কোন সমস্যা ছিল না। কেননা রুশসহ সাতটি ভাষা তিনি জানেন। পড়তে পড়তে তার মনে হল, ক্রুশ্চেভের ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। পড়তে পড়তে তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন এবং চটজলদি প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়নের বাসভবনে গেলেন। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বললেন, এটা অবশ্যই আপনার পড়া উচিত। বেন গুরিয়ন রুশ ভাষা জানতেন এবং ভাষণটি তিনি পড়লেন। পরের দিন সকালে তিনি ম্যানোরকে জরুরী ভিত্তিতে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, এটি একটি ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট। এবং এটি পড়ে মনে হয়েছে ভবিষ্যতে রাশিয়া একদিন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

ইসার ভাষণটি পান ১৫ এপ্রিল। এবং উপলব্ধি করলেন এটি ইসরাইলের খুবই উপকারে আসবে। বিশেষ করে এই ভাষণের কল্যাণে মোসাদের সঙ্গে সিআইএর সম্পর্ক আরও মধুর ও ঘনিষ্ঠ হবে।

১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে বেনগুরিয়ান জেনারেল ওয়াল্টার বেডেল স্মীথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই জেনারেলের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ইউরোপে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্মীথ ছিলেন সিআএইর পরিচালক। বেডেল কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে সিআইএর সম্পর্ক সীমিতভাবে গভীর করতে সম্মত হয়েছিলেন। ওদিকে মোসাদের জন্ম মাত্র ১৯৪৭ সালে। সোভিয়েত এবং ইস্টার্ণ ব্লকের অভিবাসীদের সম্পর্কে তথ্যাদি নিতে ইসরাইলের সহযোগিতাকে আমেরিকা খুব গুরুত্ব দিয়েছিল। বহু প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান এমন কী সেনা

কর্মকর্তা যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ওয়ারশতে কাজ করেছেন তাদের পক্ষে কম্যুনিষ্ট ব্লকের সেনা ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জানানো সহজ। ইসরাইল আমেরিকাকে এসব তথ্য প্রকৃতপক্ষেই সরবরাহ করে আসছিল। আমেরিকা এসব খবরে দিনকে দিন চমৎকৃত হচ্ছিল। আমেরিকা তাদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান প্রবাদ পুরুষ জেসাস এ্যাংগলেটনকে ইসরাইল তথা মোসাদের সঙ্গে সম্পর্কন্নোয়নে লিয়াজো অফিসার নিযুক্ত করল। জেসাস ইসরাইল সফর করলেন এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি আমোস ম্যানোরের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এমনকী তার ছোট্ট দুই রুমের বাসায় স্কচ খেয়ে খেয়ে কয়েকটি দিন থাকলেনও।



বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে ইজরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গুরিয়োন

কিন্তু এবার ইসার এবং আমোস অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমেরিকার হাতে তুলে দিতে উদগ্রীব হলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন ক্রুশ্চেভের ভাষণ তারা সরাসরি ওয়াশিংটনে পৌছে দেবেন। তবে তেলআবিবের সিআইএ অফিসের মাধ্যমে নয়। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত মোসাদ প্রতিনিধি ইজি ডোরেটকে ভাষণের কপি এক বিশেষ বার্তা বাহকের মাধ্যমে বাহককে পাঠিয়ে দিলেন। এই কপি

দ্রুতগতিতে পৌঁছে গেল জেসাস এ্যাংগ্লেটনের হাতে। ১৭ এপ্রিল জেসাস ক্রুশ্চেভের সেই ভাষণ পৌঁছে দিলেন এ্যালন দুল্লেমের হাতে এবং সেদিনই ভাষণটি পৌঁছে গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের টেবিলে।
মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানরা এই ভাষণটি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ইসরাইলের ক্ষুদ্র গোয়েন্দা সংস্থা যে বিশাল কাজটি করেছে তার কাছে ব্রিটেন ফ্রান্স তুচ্ছ। সিআইএর সিনিয়ার কর্মকর্তারা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ভাষণটি জাল নয়।

এর ভিত্তিতে সিআইএ ভাষণটি নিউইয়র্ক টাইমসের কাছে ফাস করে দিলেন। ১৯৫৬ সালের ৫জুন নিউইয়র্ক টাইমস ক্রুশ্চেভের ভাষণটি প্রথম পাতায় ছেপে দিলে বিশ্বব্যাপী যেন ভূমিকম্প হয়। কম্যুনিষ্ট বিশ্বে আলোড়ন হয়। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, এই ঘটনায় পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান এবং সভা সমাবেশ হতে শুরু করে।

ইসরাইলের এই ইন্টেলিজেন্স ক্যু মোসাদ ও সিআইএ তথা আমেরিকার সম্পর্ককে আরও গভীর ও মধুর করে তোলে। লুসিয়া যে ফাইলটি ভিক্টরকে প্রায় তাচ্ছিল্য ভরে দিয়েছিলে সেই ফাইলটির কারণে ইসরাইলের মোসাদ হিমালয় সদৃশ মর্যাদা লাভ করে।

ভিক্টর যে, ক্রুশ্চেভের ভাষণ আমেরিকায় পাচারের মূল ব্যক্তি কারো মনে তা নিয়ে কোন সন্দেহের উদ্রেক হল না। ১৯৫৭ সালে ভিক্টর ইসরাইলে স্থায়ী হল। ম্যানোরের কাছে সে কৃতজ্ঞ। কেননা ম্যানোর তাকে ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে একটা চাকুরী পাইয়ে দিলেন। পূর্ব ইউরোপের ডেস্কে তাকে বসানো হল। কিছুদিনের মধ্যেই ভিক্টরকে সরকার পরিচালিত রেডিও কোল ইসরাইলের সম্পাদক ও রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল। রেডিওর পোলিশ সেকশানে তার কাজ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ভিক্টর তার তিন নম্বর চাকুরীটি পেল। ইসরাইল থেকে আসার পর ভিক্টর একটি স্কুলে জনাকয়েক সোভিয়েত কূটনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ইমিগ্রান্ট ও বিদেশিদের যে স্কুলে হিব্রু ভাষা শেখানো হয় সেখানেই তাদের আলাপ। একজন রুশ কূটনীতিক পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে ভিক্টরের সঙ্গে পরিচিত হন এবং একজন অভিবাসী হিসেবে বড় পদে আছেন জেনে খুব খুশি হন। এদিকে এক কেজিবি এজেন্ট ভিক্টরের পোল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিচয় উল্লেখ করেন এবং অতীতের কথা স্মরণ

করিয়ে দেন। কেজিবি এজেন্ট অতঃপর ভিক্টরকে ইসরাইলে তাদের এজেন্ট হওয়ার অফার দেন। ভিক্টর বিষয়টি নিয়ে ভাববেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোসাদের সদর দফতরে সরল মনে উপস্থাপন করেন। ভিক্টর জানতে চান তার এখন কী করণীয়। মোসাদের লোকজন খুশিতে আত্মহারা হয়ে চমৎকার চমৎকার বলে এই প্রস্তাব গ্রহণের অনুমতি দেন। ভিক্টর এখন হলেন ডাবল এজেন্ট অর্থাৎ নিজ দেশ ইসরাইল এবং ভিনদেশ রাশিয়ার। তবে শর্ত হল ভিক্টর সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভুয়া তথ্য দেবেন।

দ্বৈত গোয়েন্দাগিরি শুরু করে ভিক্টর দীর্ঘদিন রাশিয়াকে ভুল খবর দিয়ে যেতে লাগল। মোসাদ যেভাবে ব্রিফ করতো রুশদের সেভাবেই খবর দিত ভিক্টর। তার কেজিবি বসরা জেরুজালেম কিম্বা দূতাবাসের রিসিপশনেও গিয়েও সে তথ্য সংগ্রহ করত। ১৪ বছর ধরে ভিক্টর এভাবে দুই দেশের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করেছে। রুশরা কোন ঘটনায় তাকে সন্দেহ করেনি এবং নিত্য নতুন খবরে তারা চমৎকৃত হয়েছে এবং ভিক্টরকে বাহবা দিয়েছে। মস্কোর কেজিবি সদর দফতরে বরং এই গুজব চালু ছিল যে তারা খুবই ভাগ্যবান। কেননা ইসরাইলে তারা এমন একজন চর পেয়েছেন যার সঙ্গে ইসরাইল সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বেশ চমকপ্রদ খবর পাওয়া যাচ্ছে।



স্ট্যালিন

দীর্ঘ ১২/১৪ বছরে একবারও সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মকর্তারা তাকে কোন প্রশ্ন করেনি বা সন্দেহের চোখে দেখেনি। কিন্তু ১৯৬৭ সালে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। এবার রুশরা ভিক্টরের অভিমত ও উপসংহার উপেক্ষা করল। মজার ব্যাপার হল এই প্রথমবার সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সত্য খবর দিয়েছিল। কিন্তু তা পাত্তা পেল না। ১৯৬৭ সালের মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের বিভ্রান্তিমূলকভাবে ভাবতে শুরু করেন যে, যে মাসে ইসরাইল সিরিয়া আক্রমণ করবে। অতঃপর তিনি সিনাই অঞ্চলে সেনা সমাবেশ ঘটান এবং জাতিসংঘের শান্তি রক্ষীদের বহিষ্কার করেন। একই সাথে তিনি সাগরের একটি প্রণালীতে ইসরাইলের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেন। ইসরাইল ধ্বংস করে দেবেন বলেও শাসান। বস্তুতপক্ষে আক্রমণের কোন ইচ্ছা ইসরাইলের ছিল না বরং ইসরাইল মিশরের সাথে যুদ্ধ ঠেকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এশকোল মোসাদকে বললেন রাশিয়ার সাথে কথা বলতে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, মিশর যদি তার আগ্রাসী মনোভাব পরিবর্তন না করে ইসরাইল সেক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বললেন, মিশরের উপর রাশিয়ার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ফলে মিশরকে ঠেকানো বা বোঝানো কঠিন হবে না। ভিক্টর কেজিবিকে ইসরাইলের প্রকৃত মনোভাব প্রমাণসহ রাশিয়াকে জানাল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিস্থিতির উল্টো ব্যাখ্যা করে বসল। রাশিয়া ভিক্টরের পরামর্শ আমলে না নিয়ে উল্টো নাসেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি জোরদার করতে বলল।

যুদ্ধের ফলাফল হল, ইসরাইলের স্বতঃ প্রণোদিত যুদ্ধে মিশর, সিরীয়া এবং জর্ডানের সৈন্যদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটল এবং ঐ দেশগুলোর বিশাল ভূখণ্ড ইসরাইলের করায়ত্ত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নও ক্ষতিগ্রস্থ হল। এই যুদ্ধে তাদের অস্ত্র নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হল। মিত্রদেশগুলো যেভাবে মার খেল তাতে রাশিয়ার মাথা কাটা যাওয়ার উপক্রম হল এবং বন্ধু দেশকে প্রতিরোধে ব্যর্থতার গ্লানি তার পক্ষে ভোলা কঠিন হল।

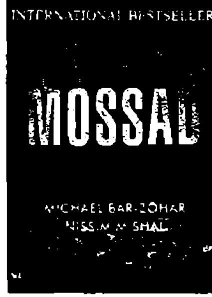
এই বছর ভিক্টর ও রাশিয়ার সম্পর্ক মধুর থেকে মধুরতর হল। মধ্য ইসরাইলের এক জংগলে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য তাকে ডাকা হল। কেজিবি গোয়েন্দা গদগদ হয়ে তাকে জানাল, সোভিয়েত সরকার তার উপর দারুন সন্তুষ্ট। কেননা তাদের প্রতি ভিক্টরের উৎসর্গকৃত

মনোভাবের কোন তুলনাই হয় না। অত্যন্ত খুশি হয়ে রুশ সরকার তাকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পদক লেনিন পদক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রাশিয়া একই সাথে দুঃখ প্রকাশ করল যে, ইসরাইলের মাটিতে ভিক্টরকে এই পদক দেয়া সম্ভব নয়। তাকে আশ্বস্ত করা হল এই পদক মস্কোতে তার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রুশরা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, যখনি ভিক্টরের সময় সুযোগ হবে সে যেন এই পদক গ্রহণ করে। ভিক্টর ইসরাইলে থেকে যেতে মনস্থ করল।

কিন্তু ভিক্টরকে কেউ ভুলে যায়নি। ২০০৭ সালে সাবাক অফিসে ভিক্টরকে দাওয়াত দেয়া হল। সাবাক ও মোসাদের বর্তমান ও সাবেক পরিচালকদের একটি গ্রুপ ওই দাওয়াতে শরীক হন। ভিক্টরের স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন সাবাক পরিচালক ডিসকিন কৃতিত্বপূর্ণ চাকুরী জীবনের জন্য ভিক্টরকে অতি সম্মানজনক একটি পদক উপহার দেন। তবে মজার ব্যাপার হল মোসাদের একমাত্র সদস্য হলেন ভিক্টর যিনি দু'বার দুটি বড় ধরনের পদক পেলেন। একটি তার নিজ দেশে- যেখানে উৎসর্গকৃত মানসিকতা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। আরেকটি তার দেশের শত্রু দেশ যাদেরকে ঝুঁকি নিয়েও ভুলেও মিথ্যা তথ্য তিনি দিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভিক্টর বলেছেন, তিনি কোন হিরো নন। তিনি কোন ইতিহাসও সৃষ্টি করেননি। ভিক্টরের ভাষায়, ইতিহাস যিনি সৃষ্টি করেচেন তিনি হলে ক্রুশ্চেভ। আমি কয়েকটি মাত্র ঘন্টার জন্য ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। এরপর আমাদের দুজনার পথ দুই দিকে বেকে গেছে।

ভিক্টর ৮১ বছর বয়সে মারা যান। ক্রেমলিনের কোথাও হয়ত লাল ভেলভেটে তার পদকটি পড়ে রয়েছে। এই পদকে লেনিনের অংকিত ছবি রয়েছে।



অপরাহ্নে মৃত্যু ও ভালোবাসা

২০০৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দামেস্কের একটি অভিজাত বাড়িকে কেন্দ্র করে বহু লোক দাঁড়িয়ে। অপরাহ্নের শেষ পর্যায়ে তারা দেখল যে, একটি মিতশুবিসি পাজেরো সুভ গাড়ি ঐ ভবনটির সামনে পার্ক করা। কালো স্যুটপরা এবং কালো দাড়ি সুন্দর করে কাটা লোকটি গাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ বাড়িতে ঢুকলেন। তার সাথে কোন বডিগার্ড ছিল না। ঐ বাড়ির সামনে দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দারা ক্ষুদ্রাকৃতির ট্রান্সমিটারে বলছে যে, 'ঐ লোকটি' দামেস্কে এসেছে এবং একটি ফ্ল্যাটের দিকে যাচ্ছে। গোয়েন্দারা জানে যে, কালো স্যুট পরা লোকটির প্রেমিকা এই বাড়িতে থাকেন এবং তার সাথে গোপন সাক্ষাতের জন্য তার আগমন। ভদ্রলোকের হাতে একটা গিফট বক্স। মেজবান মহিলা কয়েকদিন আগে তার ত্রিশতম জন্মদিন পালন করেছেন।

প্রেমিক ঐ বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে কয়েক ঘন্টা কাটান। এই বাড়ির সাথে সফল ব্যবসায়ী এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের কাজিন রামি মাকলাউফের একটা সম্পর্ক রয়েছে। রাত ১০টা বাজার কিছু আগে কালো কোর্ট পরা আগন্তুক ঐ বাড়ি ত্যাগ করেন এবং নিজের গাড়িতে ওঠেন। তিনি এখন ফরেন একটি হাউজে যেখানে তার সাথে বৈঠক হবে ইরান, সিরীয় এবং ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতদের সাথে।

লন্ডনের সানডে এক্সপ্রেস পত্রিকা জানায়, গোয়েন্দারা ঐ দিন ভদ্রলোকের বেশ কয়েকটি ছবি তোলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। কেননা পরবর্তীতে যাচাই ও

জবাবদিহিতার জন্য এই ছবির প্রয়োজন হতে পারে। গোয়েন্দারা আগন্তুকের প্রতিটি পদক্ষেপের বলতে গেলে ধারাবিবরনি দিয়ে যাচ্ছিল। মোসাদ গোয়েন্দারা তেল আবিবেও এই খবর প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছিল। দামেস্কে তো বটেই। মোসাদ জুড়ে এই ঘটনায় একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হল। তেলআবিবে মোসাদ প্রধান দাগানের অফিসে অন্যান্য বিভাগীয় গোয়েন্দা প্রধানরাও উপস্থিত হন। সেখানে আরও কিছু যন্ত্রপাতি বসিয়ে আগন্তুকের আসা-যাওয়ার প্রকৃত সময় রেকর্ড করা হয়।
ভদ্রলোক গাড়ি চালানো শুরু করলেন। এই খবরও মিনিয়েচার মাইকে করে যথাস্থানে জানিয়ে দিল গোয়েন্দারা।

সিলভার পাজারোর এই ভদ্রলোকের নাম ইসাদ মুগনিয়া। তার জীবনের সাথে বহু আগে থেকেই জড়িয়ে আছে অনেক রক্তাক্ত ইতিহাস। ২০০১ সালের নভেম্বরে সুপরিচিত টুইন টাওয়ার হামলার জের ধরে এফবিআই একটি বিশালকার পোস্টার ছেপেছিল। সেই পোস্টারে বিশ্বের মোস্ট ওয়ান্টেট ২২জন সন্ত্রাসীর নাম ও ছবি ছাপা হয়েছিল। পোস্টারে এফবিআই যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের লোগো ছিল। প্রথম নামটি ছিল সর্বোচ্চ ভয়ানক। তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ৫০ লাখ ডলার। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের আগেই মার্কিনিদের হত্যার ব্যাপারে তার ভূমিকাই ছিল সর্বোচ্চ বেশী। কোন জীবিত সন্ত্রাসী এত বেশী মার্কিন হত্যায় জড়িত ছিল না।

যেমন ইসাদ মুগনিয়ার নেতৃত্বে লেবাননের বৈরুতে মার্কিন দূতাবাসে যে হামলা হয় তাতে ৬৩ জন নিহত হয়। ১৯৮৩ সালের ২৩ অক্টোবর বৈরুতের মেরিন সদর দফতরের হামলায় ২৪১জন নিহত হয়। এটাই ছিল বৈরুতের ফ্রেঞ্চ প্যারাট্রুপার সদর দফতরের হামলায় ৫৮জন নিহত হয়। সিআইএ কর্মকর্তা উইলিয়াম বাকলেকে অপহরণ ও হত্যার সাথেও মুগনিয়া জড়িত। কুয়েতে বেশ কয়েকবার মার্কিন দূতাবাসে হামলা হয়। বিএডব্লিউট এয়ারলাইনের ও দুটি কুয়েত এয়ারলাইনের দুটি প্লেন ছিনতাই, জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক কর্নেল হিংগিসকে হত্যা, সৌদি আরবে ২০জন মার্কিন সৈন্যকে ম্যাসাকারের সঙ্গে ইমাদ মুগনিয়া জড়িত ছিলেন।

মুগনিয়ার অপরাধ কর্মের তালিকা যখন ইসরাইলে পাঠানো হলো, মোসাদ তার সাথে আরও কিছু যোগ করল। ১৯৮৩ সালের ৪ নভেম্বর লেবাননের আইডি

এক সদর দফতরের হামলায় ৬০ জন নিহত হয়। ১৯৮৫ সালের ১০ মার্চ আইডিএফ কনভয়ের উপর হামলায় ৮ জন নিহত হয়। মেতুল্লাহ সেই হামলার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯২ সালের ১৭ মার্চ আর্জেন্টিনায় ইসরাইলি দূতাবাসে বোমা হামলায় নিহত হয় ২৯জন। ১৯৯৪ সালের ১৮ জুলাই বুয়েনস আয়ার্সে ইহুদী কমিউনিটি সেন্টারে হামলায় ৮৬ জন নিহত হয়।
তালিকা আরও দীর্ঘ। হারডোভ সীমান্তে তিনজন ইসরাইলি সৈন্যকে অপহরণ ও হত্যা, ইসরাইলি ব্যবসায়ী এলহানানকে অপহরণ, কিববুটজ মাটজুবায় বোমা হামলা, রেগেট নামে এক ইসরাইল সেনাকে হত্যার সঙ্গে তারা জড়িত। ইসরাইল লেবানন সীমান্তের গোল্ডওয়াসারের ঘটনায় দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধের অবতারণা হয়।



নেতানিয়াহু এবং মেয়ার দাগান

ইসাদ মুগানিয়ার উল্লেখিত সবগুলো হামলার সঙ্গেই যুক্ত। তাকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেননা তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে সারাক্ষনই যাতায়াত করে থাকেন। তিনি ফটোগ্রাফারদের সব সময়ই এড়িয়ে চলেন। কোথাও সাক্ষাৎকার দেন না। পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু অবহিত কিন্তু তার অবয়ব, তার অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। তারা শুধু জানে, মুগনিয়ার জন্ম দক্ষিণ

লেবাননের একটি গ্রামে, ১৯৬২ সালে তার জন্ম। তার সম্পর্কিত টুকরা-টাকরা খবর থেকে জানা যায়, তার বাবা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ শিয়া। কিশোর বয়সে মুগনিয়া বৈরুতে চলে যান এবং দারিদ্রপীড়িত এলাকায় বেড়ে ওঠেন। পিএলও সম্পর্কিত ফিলিস্তিনিদের বসবাস এই এলাকায়। তিনি হাইস্কুলে থাকতেই ঝরে পড়েন এবং পরবর্তীতে ইয়াসির আরাফাতের ডেপুটি আবু আয়াদের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৮২ সালে ইসরাইল লেবানন যুদ্ধের সূচনা করে। ইসরাইলের ভাষায় অপারেশন পিসফর গ্যালিলি ছিল এই যুদ্ধ বা অভিযানের নাম। ইসরাইল লেবাননে ঢুকে পিতলকে ধ্বংস করে। ইয়াসির আরাফতসহ পিএলএর জীবিত সদস্যরা পালিয়ে তিউনেশিয়া চলে যান। মুগনিয়া কিছুটা পেছনে থাকার ফন্দি করেন এবং হেজবুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতাদের প্রথম গ্রুপে যোগদান করেন।

হেজবুল্লাহ শব্দের অর্থ হল আল্লাহর দল। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি মূলত শিয়া সন্ত্রাসীদের চরমপন্থি দল। লেবাননে ইসরাইল আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়াতুল্লাহ খামেনীর উৎসাহে এবং ইরানের রেভ্যুলেশনারি গার্ডের অস্ত্র ও অর্থায়নে এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে। হিজবুল্লাহ অবশেষে ইসরাইলের জাত শত্রুতে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই হিজবুল্লাহ ইসরাইলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। এবং মুগনিয়ার যোগদান এই বর্ধনশীল গ্রুপের জন্য একটি একটা বিরাট প্রাপ্তি। পর্দার আড়ালে থাকার পক্ষপাতী মুগনিয়া গোপনে অভিযান চালাতেই আগ্রহী। তার সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড যে তথ্যাদি পাওয়া তার কিছু আবার স্ববিরোধী। একটি সূত্র মতে, মুগনিয়া হিজবুল্লাহর আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ফাদআল্লাহর দেহরক্ষী ছিলেন।

আরেক সূত্রের দাবি, তিনি হিজবুল্লাহর অপরাশেন বিভাগের প্রধান ছিলেন। কারো মতে তিনি হিজবুল্লাহর ব্রেন এবং হিজবুল্লাহর ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানগুলোতে প্রচুর সংখ্যক লোক নিহত হন। এতবড় নেতা হওয়ার সত্ত্বেও মুগনিয়া কখনো টিভিতে আসেনি আবার ঘৃণাভরা বক্তৃতাও দেননি। কিন্তু বাস্তবতা হল মুগনিয়া হেজবুল্লাহর বর্তমান প্রধান শেক নসরুল্লাহ–যিনি বহুভাষী এবং বাকপটু তার চেয়েও অনেক বেশী ভয়ংকর। অত্যল্প সময়েই মুগনিয়া বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ

এবং অধরা নেতায় পরিণত হন। এক সময় কার্লোস যেমন দুর্ধর্ষ ছিলেন এমনকী ওসামা বিন লাদেনের চেয়েও তিনি ভয়ংকর।

মুগনিয়াকে যেমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির বলা হয় তেমনি তিনি একজন সৃজনশীল সন্ত্রাসীও। তার উত্থানটা ঘটে হঠাৎ করেই। বিশেষ করে তার পরিকল্পনা ও কমান্ডেই লেবাননে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়। আর ইসরাইলের পিস ফর গ্যালিলি অভিযানের পরই তার কার্যক্রম অতিমাত্রায় চোখে পড়ে। তার বয়স যখন মাত্র ২১, অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের অক্টোবর- তখন তিনি বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক পাঠিয়েছিলেন। আত্মঘাতী বোমাবাজরা এই ট্রাক চালিয়েছিল। এই ট্রাক পাঠানো হয়েছিল বৈরুতের আমেরিকার মেরিনে এবং ফ্রান্সের প্যায়াট্রুপের সদর দফতরে। এর কিছুদিন পরেই অনুরূপ ট্রাক তিনি পাঠিয়েছিল টায়ারের আইডি সদর দফতরে।

২২ বছর বয়সে তার নেতৃত্বে কুয়েতের দেয়ালঘেরা মার্কিন দূতাবাসে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এরপরই কুয়েতে তিনি প্রথম বিমান ছিনতাই করেন। প্রতিটি অভিযানের পরই অকুস্থল থেকে তিনি লাপাত্তা হয়ে যান। ২৩ বছর বয়সে মুগানিয়া টিউব্লিউর-এর বিমান ছিনতাই করেন। এথেন্স থেকে বিমানটি রোম যাচ্ছিলো। বিমানের চালককে প্লেনটি বৈরু, বিমান বন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তার আঙ্গুলের ছাপ দেখে পরে তা চিহ্নিত হয়। এ রকম আরও বহু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত।

তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে জানা যায় খুব কমই। তবে তিনি তার কাজিনকে বিয়ে করেন এবং এক ছেলের এবং এক মেয়ের বাবা। জীবনের শুরুতেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, পশ্চিমা গোয়েন্দারা তার মুণ্ড নিতে আগ্রহী। ফলে বরাবরই তিনি ব্যক্তিগত জীবন তেমন প্রকাশ করতেন না। লিবিয়ায় তিনি প্লাস্টিক সার্জারী করেন। দাড়ি রাখেন। মুগনিয়ার ছবিও দুর্লভ। একটি মাত্র নিশ্চিত ছবি পাওয়া গেছে তার।

মোটা, দাড়িওয়ালা, চোখে চশমা এবং মুখোশের মত একটা টুপি পরা। তার পরিচয়ও পশ্চিমা গোয়েন্দারা সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারেনি। যেমন এফবিআই বলছে তার জন্ম লেবাননে। ভাষা আরবী। চুল ও দাড়ি বাদামি,

উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, ওজন ৬০ কেজি ইত্যাদি। তবে মুগানিয়ার ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল তিনি সুচারুভাবে নিজেকে রক্ষায় সক্ষম।

মুগানিয়া বোমাবাজি, ছিনতাইয়ের যত ঘটনা সফলভাবে ঘটিয়েছেন হিজবুল্লাহর মধ্যে তিনি ততবেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। সাহসিকতা ও সাফিসিটি কেশনের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ। অভিযানে তিনি বরাবর প্রতিভার সাক্ষর রেখে চলেছে। ফলশ্রুতিতে হিজবুল্লাহ পশ্চিমাদের কাছে এক মূর্তিমান আতংকে পরিণত হয়েছে। তার ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তিনি ইসরাইল ও পশ্চিমা গোয়েন্দাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছেন। মুগানিয়া তা অনুভব করে সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখেন। এমনকী তার আস্থাভাজনদের উপরও তার নজরদারি রয়েছে। একারণেই বডিগার্ড তিনি প্রায়শই বদলান। পরপর দু'রাত্রি তিনি কোথাও ঘুমান না। বৈরুত দামেস্কে ও তেহরানে তার যাওয়া-আসার ব্যাপারটি গোপনীয়তার মধ্যে প্রতিপালিত হয়।

মোসাদ ও পশ্চিমা গোয়েন্দারা তার যে প্রোফাইল বানিয়েছে তাতে তাকে নিঃসঙ্গ, ক্যারিসমেটিক, আবেগপ্রবণ এবং সর্বশেষ ইলেকট্রনিক সামগ্রী সম্পর্কে সম্যক অবহিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চেহারা ও গেটআপ বদলাতে তার জুড়ি নেই। তাইতো ইসরাইলের গোয়েন্দারা তার প্রাণকে কই মাছের প্রাণ বলে থাকে।

সাবেক গোয়েন্দা ডেভিড বারকাই লন্ডনের সানডে টাইমের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমরা তাকে আশির দশকের শেষ দিক থেকেই ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। তার জীবন বৃত্তান্ত প্রতিনিয়তই পাল্টিয়ে চলেছে গোয়েন্দারা। সত্যি বলতে কী, তার কোন দুর্বল জায়গা নেই। মেয়ে মানুষ, টাকা-পয়সা, মাদক কোন ব্যাপারেই কোন দুর্বলতা নেই।

মুগানিয়াকে আটকের অভিযান বেশ পুরানো। ১৯৮৮ সালে প্যারিসে এয়ারপোর্টে স্টপ ওভারের সময় ফ্রেঞ্চ সরকার তাকে আটক করতে পারত। সিআইএ ফ্রান্স সরকারকে প্যারিসে তার অবস্থানের কথা জানিয়েছেন তার ছবি, তার জাল পাসপোর্ট সম্পর্কেও সিআইএ তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু ফ্রান্স সরকার তাকে গ্রেফতার করতে ভয় পাচ্ছিল। কেননা ঐ সময় লেবাননে ফরাসী জিম্মিদের মুক্ত করা নিয়ে আলোচনা চলছিল। তাকে আটক করলে

জিম্মিদের হত্যা করা হত। ফলে ফ্রান্স সরকার তার প্যারিসে উপস্থিতির বিষয়টি ইগনোর করে। ১৯৮৬ সালে মার্কিন গোয়েন্দারা তাকে ইউরোপে এবং ১৯৯৫ সালে সৌদি আরব তাকে গ্রেফতার চেষ্টা চালালেও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ঐ সময়কালে মুগানিয়া আর্জেন্টিনায় ইসরাইলি ও ইহুদী নিধনে খুব তৎপর ছিলেন। এই দফায় তার নারকীয় কর্মকাণ্ডের বিশাল বর্ণনা দেয়া যায়। এই সময়কালে মুগানিয়া ইরানে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেন। শেখ আল মুসায়িকে হত্যার পর ইসরাইল তাকে ইরানে ঢুকেও হত্যা করতে পারে বলে তার আশংকা হয়। তেহরানে মুগানিয়া একটা অপারেশনাল টিম তৈরি করেন হিজবুল্লা যোদ্ধা ও ইরানের গোয়েন্দা বাহিনীর লোকদের নিয়ে।

রেভুলেশনারি গার্ডের প্রধান এবং মুগানিয়ার বন্ধু মোহসেন রিয়াজী এবং গোয়েন্দা মন্ত্রী আল কাল্লা হিয়ান ছিলেন এইটিম গঠনে তার সহযোগী। এই টিম বুয়েন্স আয়াসে মারাত্মক দুটি অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানের ফলে মুগানিয়া ইসরাইলের প্রধান শত্রুতে পরিণত হন। আসলে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুগানিয়া তার মৃত্যুকে নিজেই আহ্বান করেন।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে মুগনিয়াকে বৈরুতে দেখা যায়। এই সময় তিনি এক হামলা থেকে বেঁচে যান। এই হামলায় মুগানিয়ার ভাই ফুয়াদ মুগানিয়া নিহত হন। মুগানিয়ার সেখানে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি তার মত বদলান। ফলে তিনি বেঁচে যান। কই মাছের প্রাণ আর কাকে বলে। এই ঘটনার পর হিজবুল্লাহকে সাথে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বহু লোককে গ্রেফতার করে। মোসাদের সহযোগী মনে করে বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু হামলার মূল নায়ক ছিলেন আহমদ হালেক নামে এক ব্যক্তি।

পুলিশের ভাষ্য মতে, হালেক এবং তার স্ত্রী ফুয়াদ মুগানিয়ার স্টোরের লাগোয়া তাদের গাড়ি পার্ক করেন। হালেক দোকানে ঢোকেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে ফুয়াদ সেখানে রয়েছে কীনা। ফুয়াদ সেখানেই ছিলেন এবং হালেক তার সাথে করমর্দন করেই গাড়িতে ফিরে আসেন। অতপর বোমাটি সক্রিয় করা হয়।

লেবাননের পত্রিকা আল সাকির বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদন ছাপে যে, হালেক সাইপ্রাসে মোসাদের পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন

এবং মোসাদের কাছ থেকে এক লক্ষ ডলার গ্রহণ করেন। মোসাদের লোকজন হালেককে শিখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে বোমাটি সক্রিয় করতে হয়। পরবর্তীতে হালেকের প্রাণদণ্ড হয়।

এবারও মুগানিয়া বেঁচে যান। এদিকে গুজব রটে যে, মুগানিয়া হিজবুল্লাহর প্রধান হতে যাচ্ছেন। শেখ নজরুল্লার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। তার মূল যোগাযোগ ছিল ইরানের গোয়েন্দা বিভাগ ও আল কুদস ব্রিগেডের সাথে। বিশ্বব্যাপী শিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে আল কুদস যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ইরান নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথেও তারা যুক্ত। মুগানিয়া উচ্চতর পদে আসীন হওয়ার সম্ভাবনায় তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়। এই সময় গুজব রটে যে, মুগানিয়া আরেকবার প্লাস্টিক সার্জারী করে তার চেহারা বদলেছেন।

ইউরোপের সূত্র মতে, দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ শেষে লেবাননে বসবাসরত বেশ কিছু ফিলিস্তিনিকে মোসাদ তাদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। এরা ছিল হিজবুল্লাহ বিরোধী। এর মধ্যে মুগানির গ্রামের একজন ছিল। সে আবার মুগানিয়া কাজিন। তার ভাষ্য, মুগানিহ যে চেহারায় ইউরোপে যায় লেবাননে ফিরে আসে ভিন্ন এক চেহারায়। মোসাদের জন্য এটা একটা নতুন চ্যালেঞ্জে পরিণত হল। ইউরোপ জুড়ে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করল।



মুগানিয়া

অভাবনীয় ঘটনা ঘটে বার্লিনে। ব্রিটিশ লেখক গর্ডন থমাস লিখেছেন: বার্লিনে নিযুক্ত মোসাদের আবাসিক গোয়েন্দা রেওভেনের সাথে এক জার্মান ইনফরমারের সাক্ষাৎ ঘটে। এই সোর্স সাবেক পূর্ব বার্লিনের লোকদের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ রাখতেন। ঐ ইনফরমার জানান, মুগানিয়া সম্প্রতি বেশ কয়েকটি প্লাস্টিক সার্জারী করেছেন। এর ফলে তাকে আর চেনাই যায় না। এই সার্জারী হয়েছে স্টাসি নাম একটি ক্লিনিকে। এক সময় এর মালিকানা ছিল সাবেক পূর্ব জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। স্টাসি তাদের নিজস্ব লোকদের প্রয়োজনে চেহারা বদলে দেয়। পূর্ব জার্মানীর বহু গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসীকে এভাবে চেহারা বদল করে পশ্চিমে মিশনে পাঠানো হত।

ব্যাপক দরকষাকষি ও দেন দরবারের পরে মোসাদ গোয়েন্দা রেওভেন ঐ জার্মান সোর্সকে ভাল টাকা দিতে রাজি হন। অতপর জার্মান সোর্স মুগনিয়ার ৩৪টি আপডেট ছবির একটি ফাইল রেওভেনকে দেন।

এরপর এই ছবি নিয়ে মোসাদ প্রধান দাগান তার দলবল নিয়ে গবেষণায় বসেন। ছবিগুলো পরীক্ষাকালে দেখা যায় মুগানিয়া তার চোয়ালের প্লাষ্টিক সার্জারী করেছেন। তার চোয়ালের নীচের অংশ কাটা হয়েছে। তার চেক লাইন সংকীর্ন করা হয়েছে। ফলে তাকে এখন আরও ইয়াং মনে হয়। সামনের দিকের অনেকগুলো দাঁত ফেলে দিয়ে সেখানে কৃত্রিম দাঁত বসিয়েছেন।

সে দাঁত আবার বিভিন্ন শেপের। চোখও বাদ যায়নি। চুল রং করে পাকিয়েছে। আই গ্লাস ফেলে দিয়ে কনট্যাক্ট লেন্স বসিয়েছেন। অর্থাৎ এক নতুন চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছেন মুগানিয়ে। জার্মান ইনফরমারের কাছ থেকে ৮০ সালের পরের মুগনিয়ার যত ছবি সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলো এখন অপাংক্তেয় হয়ে গেছে।

বিদেশী সূত্র মতে, মোসাদ অতঃপর মুগানিয়াকে হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। দাগান তার সেরা লোকদের একাজে ডাকেন। কায়েসাবেয়ার প্রধান কিডোন টিমের কমান্ডারসহ যারা মুগনিয়ার ফাইল দেখতেন তেমন বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয় অমুসলিম কোন দেশে মুগনিয়াকে হিট করা যাবে না। কেননা তিনি পশ্চিমের দেশগুলোতে খুব বেশী যাতায়াত করেন না। একমাত্র ইরান ও সিরিয়ায় ভ্রমনে

তিনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ইরান ও সিরিয়ায় মুগনিয়াকে হিট করা বেশ ঝুঁকিপূর্ন কাজ। একথা সত্য, অতীতে ইসরাইল আরব দেশসমূহে অভিযান পরিচালনা করেছে। বৈরুতে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। ইসরাইলী কমান্ডো তিউনিশিয়া অভিযান চালিয়েছে। তিউনেশিয়ার মাটিতেই তারা নেতা আবু জিহাদকে হত্যা করেছে। সমস্যা হল তেহরান ও দামেস্ক অনেক বেশী সন্দেপ্রবন ও ঝুঁকিপূর্ণ। বৈরুত অথবা তিউনিশিয়ার চেয়ে সিরিয়া ও ইরানের সমর শক্তিও বহু গুন বেশী। এদিকে মোসাদ প্রধান দাগান জানেন। যদি এই অভিযান সফল হয় তার প্রভাব পড়বে সুদূরপ্রসারী। ভয়ংকর সন্ত্রাসী মুগানিয়াকে দামেস্কে হত্যা করা হলে প্রমাণিত হবে মোসাদের হাত খুব লম্বা। এর ফলে ইসরাইল বিরোধি সব নেতারা নিরাপত্তাহীনতায় যেমন ভুগবে তেমনি কনকিউশানও বহুগুন বৃদ্ধি পাবে। ছড়িয়ে পড়বে আতঙ্ক।

লন্ডন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার ভাষ্য হল, মোসাদের সদর দফতরের সবার মাধ্যমে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা মূলত ২০০৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মুগানিয়ার দামেস্কে আসাকে কেন্দ্র করে। যদি তিনি না আসেন? প্রকৃতপক্ষে ঐদিন তার আসার কারণ হল, ইরানের বিপ্লব দিবসকে সামনে রেখে সিরীয়া ও ইরানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। অতঃপর মুগানিয়ার আসার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা পরীক্ষা নিরীক্ষা হল। সিদ্ধান্ত হয় মুগনিয়ার গাড়ির গা ঘেষে একটি সুসজ্জিত গাড়ি রাখা হবে।

মোসাদ অতঃপর দেশ বিদেশের নানা গোয়েন্দা সূত্র থেকে মুগনিয়ার আগমন নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট সংগ্রহে মরিয়া হয়ে উঠল। যদি তিনি আসেনই তাহলে কোন পরিচয় তিনি মুখ্য করে দেখাবেন, তার গাড়িটি কেমন হবে, তিনি কোথায় অবস্থান করবেন, তার সফরসঙ্গী কে হবেন-এনিয়ে ভেবে ভেবে মোসাদের লোকজনের গলদঘর্ম হওয়ার উপক্রম হল। সিরিয়া ও ইরানের কর্মকর্তাদের সাথে পূর্বপরিকল্পিত বৈঠকটি কখন শুরু হবে এ নিয়েও মোসাদের কম দুঃশ্চিন্তা ছিল না। তার আগমনের বিষয়টি কী সিরিয়া কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে, হিজবুল্লাহ নেতারা কী তার আগমনের ব্যাপারে কিছু জানে; এমনতরো প্রশ্ন আলোচিত হয়।

মুগানিয়াকে একেবারে শেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়টি একটি বিশ্বস্ত সূত্রে থেকেও জানা যায়। সূত্রটি মুগানিয়ার দামেস্কে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

এই তথ্য যে সঠিক তারও সত্যতা মিলে যায়। লেবাননের পত্রিকা এল বালাদও সত্যতা নিশ্চিত করে।

গোয়েন্দা সংস্থা কায়েসারেয়ার মেশিনপত্র প্রয়োজনীয় পয়েন্ট বসানো হয়েছে। কিডোন টিম দামেস্কে এসে পৌছেছে। সিরিয়ার রাজধানী থেকে ইসরাইলী গোয়েন্দারা ব্যাপক পরিমাণ বিস্ফোরক চোরাই পথে সংগ্রহ করে ফেলেছে।

অবশেষে মোসাদ জানতে পারল মুগানিয়াকে নিয়ে বিস্ফোরক একটি খবর। মোসাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জানায়, মুগানিয়া যখনই দামেস্কে আসেন তার মিসট্রেসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রথমবারের মত মোসাদ জানতে পারল মুগানিয়ার একটা গোপন জীবন রয়েছে। এই সুন্দরী রমনী শহরের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে মুগানিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুন্দরী মুগানিয়ার আগমনের সংবাদ অবশ্যই আগে ভাগে জানেন। বৈরুতে অথবা তেহরান থেকেই এই খবর এসেছে। মুগানিয়া তার প্রিয় বান্ধবীর কাছে যখন যান তখন তার ড্রাইভার বা দেহরক্ষী কিছুই থাকে না। বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বরত গোয়েন্দাদের বার্তা দিয়ে তাদের সতর্ক করা হল। এবারও কী মুগানিয়া তার প্রেমিকার বাড়িতে যাবেন? বাড়ির মালিক কী জানেন যে, মুগানিয়া আসছেন?



ইয়াসির আরাফাত

অভিযানের প্রাক্কালে হিট টিমের সদস্যরা দামেস্কে আসে। তারা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে আসে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে। ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী হিট টিমে ছিল তিন জন। একজন এল এয়ার প্যারিস থেকে। দ্বিতীয় জন আসে ব্রিটেন থেকে এবং তৃতীয় জন আসেন আম্মান থেকে রয়্যাল জর্ডানিয়ান প্লেনে। কাগজপত্র জাল করে ব্যবসায়ী হিসেবে তারা দামেস্কে ঢোকে। দু'জন গাড়ির ব্যবসায়ী আরেকজন ট্রাভেল এজেন্টের পরিচয় দেয়। আসার সময় তারা ডিক্লারেশন দেয় স্বল্প সময়ের ভ্যাকেশনে তারা সিরীয়া এসেছে।

ফলে ইমিগ্রেশনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি। তারা শহরে বিচ্ছিন্ন ভাবেই ছিল। যখন দেখল কেউ তাদের ফলো করছে না তখন তারা একত্রে মিলিত হয়। তারা তাদের কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে। তারা আবার এসেছে বৈরুত থেকে। তাদের একটি গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে একটি ভাড়া গাড়ি অপেক্ষমাণ ছিল। এর সাথে ছিল বিস্ফোরক।

তিন গোয়েন্দা ঐ গ্যারেজে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। বিস্ফোরক প্রস্তুত করে ভাড়া করা গাড়িতে তা তোলা হয়। এই বিস্ফোরণের সাথে চার্জ তখনো জুড়ে দেয়া হয়নি।

মোসাদের আরেকটি টিম বৈরুত থেকে মুগানিয়ার আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তাদের কাজ ছিল মুগানিয়ার বান্ধবীর বাড়িতে তিনি ঢুকলেন কী না তা লক্ষ্য রাখা এবং তার ঐ গাড়ি ত্যাগের ব্যাপারে রিপোর্ট করা। এই টিমটি মুগানিয়াকে যথার্থভাবে ফলো করে। মুগানিয়া যে মিটিংয়ে গেছেন সে তথ্যও তারা জানায়। যেসব লোকের সাথে মুগানিয়া বৈঠক করেন তাদের মধ্যে ছিলেন দামেস্কে ইরানের নতুন রাষ্ট্রদূত এবং সিরিয়ার সর্বোচ্চ মূল্যবান ব্যক্তি জেনারেল মোহাম্মদ সুলাইমান।

জেনারেল সুলাইমান ইরান ও সিরিয়া থেকে হিজবুল্লাহকে অস্ত্রসরবরাহের ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তি। সিরিয়ার পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনেও তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি এই ঘটনার পরে মাত্র ৬মাস বেঁচেছিলেন। এক ডিনার পার্টিতে মোসাদের লোকজন তাকে গুলি করে হত্যা করে।

যে স্থানে মুগানিয়ার ইরান ও সিরিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক তার কাছেই ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখানে ইরানের বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান নির্ধারিত ছিল। মুগানিয়া ঐ উৎসবে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং দামেস্ক ছেড়ে যেতে মনস্থ করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি মোসাদ টিম পূর্ব পরিকল্পিত অবস্থানেই ছিল। মুগানিয়ার বান্ধবীর বাড়িকে কেন্দ্র করে ওয়াচার টিমও অবস্থান নেয়। এটাই মুগানিয়ার প্রথম গন্তব্য স্থল। অপরাহ্নে গোয়েন্দারা জানায় যে, মুগানিয়া তার প্রেমিকার বাড়িতে। এক পর্যায়ে তারা আরও জানায় মুগানিয়া তার পরবর্তী গন্তব্যের জন্য তৈরি হচ্ছেন। গোয়েন্দারা আশা করছে এটাই হয়ত মুগানিয়ার শেষ যাত্রা।

মুগানিয়ার পাজেরো যেখানে রাখা হতে পারে সেখানে একটি ঝকমকে গাড়ি আগে থেকেই রাখা ছিল। প্রতি মুহূর্তে মুগানিয়ার তথ্যাদি পাঠানো হচ্ছে বহুদূরে সিনিয়র গোয়েন্দাদের কাছে। ঝকমকে গাড়িটি যারা রেখেছিল তারা আর সেখানে নেই বিমানবন্দরের দিকে চলে গেছে। এদিকে ইলেকট্রনিক সেন্সর মুগানিয়ার গাড়ি ফলো করে চলেছে। গাড়িটি থামল। মোসাদের এক সহযোগী মুগানিয়ার গাড়ির পাশে নতুন গাড়িটি নিয়ে রাখল।

রাত ১০টা বাজার সামান্য আগে কফরসৌসা এলাকা কাপিয়ে বিরাট এক বিস্ফোরণ ঘটল। ইরানী স্কুলের কাছেই স্থানটি। স্কুলটি অবশ্য ফাঁকা ছিল। যাহোক যে মুহূর্তে মুগানিয়া গাড়ি থেকে বেরুলেন তখনই তার পাশের গাড়িটি বিস্ফোরিত হয়। মুগানিয়া মারা যান।

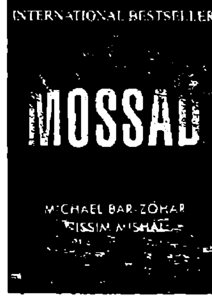
তার মৃত্যুতে হিজবুল্লাহর শীর্ষ পর্যায়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। সিরিয়ার সরকারের জন্যও এটি একটি বড় ধাক্কা।

মুগানিয়ার মৃত্যুর ছয় মাস পর ২০০৮ সালের নভেম্বরে লেবানন সরকার ঘোষণা করে যে, তার মৃত্যুর নেপথ্যে মোসাদের একটি গোয়েন্দা গ্রুপ কাজ করেছে। এ ঘটনায় ৫৫ বছর বয়স্ক আলী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। সাত হাজার ডলার বেতনে আলী মোসাদের পক্ষে ২০ বছর ধরে গোয়েন্দাগিরি করে আসছিল। সে মোসাদের হয়ে প্রায়ই সিরীয়া আসত মুগানিয়াকে হত্যার কিছু দিন আগে ঐ এলাকায় সে গিয়েছিল বলে অভিযোগ

আনা হয়। লেবাননের গোয়েন্দারা আলীর কাছ থেকে অনেক যন্ত্রপাতি, ভিডিও ও ক্যামেরা ইত্যাদি তার গাড়ি থেকে আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে আলী স্বীকার করে যে, মোসাদের নির্দেশ মত ছবি তোলা, নজরদারি করা, মুগানিয়ার প্রেমিকার বাড়ি ও প্রতিবেশীর খোঁজ নেয়ার দায়িত্ব সে পালন করেছে। ইসরাইল মুগানিয়ার হত্যার সাথে তাদের যোগসূত্র থাকার কথা অস্বীকার করে। কিন্তু হিজবুল্লাহ মুগানিয়াকে শহীদ হিসেব অভিহিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট হিজবুল্লাহর বক্তব্য খন্ডন করে মুগানিয়াকে একজন ঠান্ডা মাথার খুনী হিসেবে অভিহিত করে। তার বিরুদ্ধে গনহত্যাসহ অসংখ্য হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে।

মককোরামাক মন্তব্য করেন মুগানিয়াকে ছাড়াই বিশ্ব এখন অনেক ভাল আছে।



ফ্রম নর্থ কোরিয়া উইথ লাভ

লন্ডনে ২০০৭ সালের চমৎকার একটি দিন। সেখানকার কেনসিংটন হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে এক লোক গেটে অপেক্ষমাণ একটি গাড়িতে উঠলেন। ভদ্রলোককে সিরিয়ার একজন সিনিয়র অফিসার এবং ঐ দিনই তিনি দামেস্ক থেকে লন্ডনে এসেছেন। এখন যাচ্ছেন একটা মিটিংয়ে।

ভদ্রলোক হোটেল ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'ব্যক্তি যারা কিছুটা দূরে অবস্থান করছিলেন তারা দ্রুত উঠে আসলেন। তারা জানেন কোথায় যেতে হবে। সিরীয় ঐ লোকের রুমে পৌঁছে গেলেন ঐ দুই যুবক। একটা বিশেষ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে তারা সিরিয়া নাগরিকের রুমটি খুলে ফেললেন। তাদের প্রশিক্ষণ হল মেথেডিক্যালি রুম সার্চ করার। কিন্তু এখানে সহজেই সব পাওয়া গেল। ডেস্কে ছিল একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। দু'যুবক ল্যাপটপ মুহূর্তের মধ্যে চালু করলেন। বিশেষজ্ঞদের মত একটা সফিসটিকেটেড সফটওয়ার তার মধ্যে ঢোকালেন। কম্পিউটারের মেমোরিতে যা ছিল তার সবই কপি হয়ে গেল। যব ডান। অর্থাৎ কাজ শেষ। দু'ব্যক্তিই কাজ শেষে সটকে পড়লেন এবং কেউই তাদের চিনতে পারলেন না। তেলআবিবে মোসাদের বিশেষজ্ঞ কম্পিউটারের ফাইলগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। ফাইলে তথ্য, ছবি, ম্যাপ ইত্যাদি ছিল। তথ্যাদি থেকে দেখা গেল সিরিয়া সরকার মরুভূমির প্রত্যন্ত এলাকায় পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন চূড়ান্ত করেছে। উত্তর কোরিয়ার সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সিরিয়ার কর্মকর্তাদের বৈঠকের ছবি ও তথ্যাদি ঐ কম্পিউটারে ছিল। যে দু'জন লোকের ছবি এই

কম্পিউটারে ছিল তাদের একজন নর্থ কোরিয়ার পারমাণবিক কেন্দ্রের, আরেকজন সিরিয়ার পারমাণবিক কেন্দ্রের পরিচালক- ইব্রাহিম ওথাম।

কম্পিউটারের কিছু তথ্য ছিল অসম্পূর্ণ। যেসব তথ্যও ২০০৬-০৭ সালের মধ্যে ইসরাইলের হাতে চলে এল। তথ্য-উপাত্তে দেখা গেল সিরিয়ার সরকার প্রচণ্ড গোপনীয়তার সাথে মরুভূমির দিল আল জুর এলাকায় পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জায়গাটি তুরস্ক সীমান্তের কাছেই। তবে ইরাক থেকে কয়েকশ মাইল দূরে। তথ্যাদি ঘেঁটে সর্বোচ্চ কৌতূহল উদ্দীপক যা পাওয়া গেল তা-হল, সিরিয়ার এই পরমাণু কেন্দ্রের পরিকল্পনাকারী ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে উত্তর কোরিয়া এবং টাকা ঢালছে ইরান।

সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার গভীর বন্ধুত্বের শুরু ১৯৯০ সালে। উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম উলসুং, ঐ সময় সিরিয়া সফর করেন। তার সফরকালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের আগ্রহে দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে সামরিক ও কারিগরি সহায়তার কথাও ছিল। এমনকী দুই সরকার প্রধানের বৈঠকে পারমাণবিক ইস্যুও প্রাধান্য পায়। আসাদ অবশ্য পারমাণবিক প্রকল্পটিকে দুই নম্বর এজেন্ডায় রেখেছিলেন। তার কাছে অগ্রাধিকার ছিল রাসায়নিক ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের। আসাদ রাশিয়ার পারমাণবিক চুল্লী কিনবেন না বলেও উল্লেখ করেন। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডেজার্ট স্ট্রমের অভিযানকালে নর্থ কোরিয়ার স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের একটি চালান প্রথম বারের মত সিরিয়ার পৌঁছায়। এই খবর সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দফতরে। বেশ কয়েকজন জেনারেল স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সচল করার আগে তা ধ্বংসের পক্ষে মত দেন। কিন্তু আপত্তি তোলের ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এই অঞ্চলে আবার এই ঘটনায় অস্থির হয়ে ওঠুক তিনি তা চাইছিলেন না।

২০০০ সালে হাফেজ আল আসাদের মৃত্যুর পর তার ছেলে বাশার আল আসাদের সাথে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি দলের একটি বৈঠক হয়। সভায় সিরিয়ার পারবাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। ২০০২ সালের জুলাইয়ে সিরিয়ার দামেস্কে সিরিয়ার সিনিয়র কর্মকর্তা, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে অত্যন্ত গোপনে একটি বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে ত্রিপক্ষীয় একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। পুরো প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয় দুই বিলিয়ন ডলার।

এর পরবর্তী পাঁচ বছর দামেস্কে থেকে পরমাণু প্রকল্প নিয়ে যে কৌশলপূর্ণ বিক্ষিপ্ত বা ছিটে ফোটা সংবাদ এসেছে তা সিআইএ কিম্বা মোসাদ কারো পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি। অনেক বিপজ্জনক বার্তা ঐ দুই সংস্থা আমলে নিতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদির গুরুত্ব আমেরিকার গোয়েন্দারা যেমন উপলব্ধি করতে পারেনি তেমনি মোসাদ এবং আমান তাদের পূর্ববর্তী ধারণার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। মোসাদরা মনে করেছিল সিরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর ইচ্ছা যেমন নেই তেমনি তারা এক্ষেত্রে অক্ষম। এমনকী মোসাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকেও কেউ পরিবর্তনের চেষ্টা করেনি। অথচ সিরিয়ার অনেক কার্যক্রমই ছিল সন্দেহজনক। যেমন ২০০৫ সালে সিমেন্টবাহী একটি কার্গো জাহাজ উত্তর কোরিয়া থেকে সিরিয়ায় যাওয়ার পথে ইসরাইলের উপকূলীয় এলাকায় ডুবে যায়। ২০০৬ সালে আরেকটি উত্তর কোরিয়ার কার্গো ভেসেল সাইপ্রাসে আটক হয়। এই জাহাজে ছিল পানামার পতাকা। আরেকটি জাহাজের কর্মকাণ্ডও ছিল অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে সিমেন্টের আড়ালে উত্তর কোরিয়া থেকে সিরিয়ার পরমাণু কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি নেয়া হচ্ছিল। অবশেষে ২০০৬ সালের শেষের দিকে ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীরা সিরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচীর অবকাঠামোগত উন্নতি পরিদর্শনে দামেস্কে যায়। ইসরাইল ও আমেরিকার গোয়েন্দারা ইরানীদের সিরীয় সফর সম্পর্কে জানলেও এর সাথে দামেস্কের দির আলজুর নামের পারমাণবিক প্রকল্পের যোগসূত্র অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।

দির আলজুর পারমাণবিক প্রকল্পের ব্যাপারে সিরিয়া ছিল অতিমাত্রায় সতর্ক। প্রকল্প এলাকায় সকল রাস্তাঘাট তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখানে কর্মরত স্টাফদের মোবাইল ফোন ও স্যাটেলাইট কর্মকাণ্ড চালানো ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ওই পরমাণু কেন্দ্রের ব্যাপারে স্পেস থেকেও কোন কিছু চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

২০০৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ্যের দাবিদার। তাকে দেখা গেল দামেস্ক বিমান বন্দরে। তার নাম আলী রেজা আসগরী। তিনি একজন ইরানী জেনারেল এবং সাবেক প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী। ইরানের রেভিল্যুশনারি গার্ডেরও তিনি একজন নেতা। দামেস্ক এয়ারপোর্টে তিনি একটি সংবাদ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। সংবাদটি হল তার পরিবার ইরান ত্যাগ

করতে পেরেছে কীনা। পরিবারের ইরান ত্যাগের খবর পাওয়ার পরেই আসগরী তুরস্কের পথে উড়ে যান। ইস্তাম্বুলে পৌঁছেই তিনি গায়েব হয়ে যান।

এক মাস পরে জানা যায়, আসগরী স্বপক্ষ ও স্বদল ত্যাগ করে সিআইএ ও মোসাদের পরিকল্পনুযায়ী পশ্চিমের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। জার্মানীতে একটা মার্কিন ঘাঁটিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তিনি অনেক তথ্য তাদের কাছে ফাঁস ও প্রত্যর্পণ করেন। সেখানে তিনি সিরিয়ার ও ইরানের পরমাণু কেন্দ্রের খবরাদি দেন এবং উত্তর কোরিয়া যে আলোচ্য পরমাণু কেন্দ্র নির্মাণের সাথে যুক্ত তা জানান। তিনি আরও জানান যে, সিরিয়ার দির আলজুর পরমাণু প্রকল্পে ইরান যে শুধু অর্থায়নই করছে তা নয়, এই প্রকল্পটি যাতে দ্রুত শেষ হতে পারে সে লক্ষ্যেও ইরান কাজ করছে। আসগরী সিরিয়ার পরমাণু কেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্যাদি সিআইএ ও মোসাদকে সরবরাহ ও ইরানের জড়িতদের নাম-ধামও সরবরাহ করেন।

এই নতুন তথ্য মোসাদের মাথা খারাপ করে দেয়। মোসাদ এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন মোসাদের প্রধান ছিলেন মেইর দাগান। বিদেশি সূত্র থেকে জানা যায়, দাগান আসগারীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করতে তার গোয়েন্দাদের নির্দেশ দেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী সেনাপ্রধানসহ সবগুলো গোয়েন্দা বিভাগের সাথে বৈঠক করে সিরিয়ার দির আলজুর পরমাণু কেন্দ্রের ব্যাপারে অভিযান পরিচালনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিরিয়া সম্পর্কে ইসরাইলের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সিরিয়া হল তাদের আগ্রাসী জাতশত্রু; তারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর। তাদের পারমাণবিক বোমার মালিক হতে দেয়া যায় না কোনমতেই। আসগারীর দল ত্যাগের ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় মোসাদের হাতে চলে আসে সিরিয়ার সেই অফিসারের ল্যাপটপ। হোটেল থেকে যা চুরি করা হয়েছিল। মোসাদ ও আমান প্রধান এখন সেই ল্যাপটপ প্রধানমন্ত্রী ওলমার্টের সামনে উপস্থাপনে সমর্থ হবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদ প্রধান দাগন বলতে গেলে আরেকটি অভ্যুত্থানের মত ঘটনা ঘটান। একটি বোল্ড ও সৃজনশীল অপারেশনের মাধ্যমে সিরিয়ার প্রকল্পের যাবতীয় ছবি ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। মোসাদের এক কেস অফিসারকে দিয়ে কাজটি করানো সম্ভব হয়।

কেস অফিসার সিরিয়ার পরমাণু প্রকল্পের এক বিজ্ঞানীর মাধ্যমে নানা ভঙ্গিতে ছবি তোলান। প্রকৃতপক্ষে এই বাস্তব ছবিগুলোই প্রথমবারের মত মোসাদের হস্তগত হয়।



জেনারেল সুলাইমান

মোসাদ প্রাপ্ত তথ্যাদি পুরোপুরোই আমেরিকাকে অবহিত করে। এমনকী আমেরিকাকে স্যাটেলাইট ছবি এবং সিরীয় ও উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তাদের মধ্যকার ফোন কলের বিবরণাদিও সরবরাহ করে। অতঃপর ইসরাইলের মরীয়া চাপের মুখে আমেরিকা তার স্যাটেলাইট সিরিয়ার পরমাণু কেন্দ্রের ওপর নিবদ্ধ করে। ইসরাইল ও আমেরিকা অতঃপর সিদ্ধান্তে আসে সিরিয়া যে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিপজ্জনকভাবে পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনের কাজ করছে।

২০০৭ সালের জুনে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ওলমার্ট উড়ে যান ওয়াশিংটনে। সাথে তার যাবতীয় তথ্যাদি। প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি তাকে জানান, ইসরাইল সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লী ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওলমার্ট প্রেসিডেন্ট বুশকে সিরিয়ার পরমাণু স্থাপনার উপর বিমান হামলা চালাতে বলেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট এতে আপত্তি জানান। আমেরিকার সূত্র মতে, হোয়াইট হাউজ চুল্লীর উপর আক্রমণ চালাতে অনাগ্রহী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস ইসরাইলকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সিরিয়ার সাথে কনফ্রন্টে যান কিন্তু আক্রমণ নয়। বুশ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্টীভ হ্যাডলি নীতিগতভাবে সামরিক অভিযানের ব্যাপারে ইসরাইলের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেন কিন্তু আরও তথ্য যাচাইপূর্বক হামলার কথা বলেন। ২০০৭ সালের জুলাইয়ে ইসরাইল সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লীর ছবি তুলতে উচ্চমাত্রার স্যাটেলাইট ব্যবহার করে। এসব ছবি মার্কিন ও ইসরাইল প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কেন্দ্রের অনুরূপ হুবহু একটি কেন্দ্র তৈরিতে সিরিয়া হাত দিয়েছে। ইসরাইল আমেরিকাকে আরও দেখায় যে, উত্তর কোরিয়া এবং সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লীও একই অবয়ব ও ধাচের। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, সিরিয়ার চুল্লীতে উত্তর কোরিয়ার প্রকৌশলীরা কাজ করছে।

ইসরাইলের অপর গোয়েন্দা সংস্থা আমান উত্তর কোরিয়া ও সিরিয়ার মধ্যকার যাবতীয় কথোপকথনের বিবরণ লিখে জমা দেয়। উল্লেখিত সব তথ্য উপাত্তই ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। কিন্তু আমেরিকা আরও প্রমাণ চাইছিল। আমেরিকা নিশ্চিত হয়ে চায় যে, ওগুলো পারমাণবিক চুল্লী কীনা এবং রেডিওএকটিভ সামগ্রী সেখানে আছে কীনা। ইসরাইল অনন্যোপায় হয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ মনোনিবেশ করে।

২০০৭ সালের আগষ্টে ইসরাইল নিশ্চিত হয় যে, সিরিয়ার পরমাণু কেন্দ্রের চুল্লীটি পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতেই ব্যবহৃত হবে। ইসরাইল তাদের একটি এলিট কমান্ডো বাহিনী পাঠায় সিরিয়ায়। নাম সায়েরেত মাটকাল। এই অভিযানে ইসরাইলী সৈন্যদের ব্যাপক জীবনের ঝুঁকি ছিল। রাতের বেলা এই বাহিনী দুটি হেলিকপ্টারে সিরিয়ায় রওয়ানা হয়। ইসরাইলী সৈন্যদের গায়ে সিরিয়ার সোনাবাহিনীর পোশাক। ইসরাইলী সৈন্যরা জনবহুল এলাকার

সামরিক ঘাঁটি, এবং রাডার স্টেশনকে এড়িয়ে দির আলজুর প্রকল্পের কাছাকাছি একটা জায়গায় অবস্থান নেয়। তারা চুল্লী এলাকায় কাছাকাছি যায় এবং চুল্লী এলাকায় মাটি সংগ্রহ করে। ইসরাইলে ফিরে এসে সেই মাটি পরীক্ষা করে দেখা যায় তা অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয়। এর অর্থ হল তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঐ এলাকায় বিদ্যমান।

উল্লেখিত নতুন প্রমাণাদি যুক্তরাষ্ট্রের স্টীভ হ্যাডলিকে দেয়া হয়। তার সহকারীরা এই মাটি পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেয় তাতে হ্যাডলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকার প্রমাণ পেয়ে যান। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় হেডলি ওভাল অফিসে প্রত্যহিক বিফ্রিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিষয়টি অবহিত করবেন। হেডলি অতঃপর দাগানের সাথেও কথা বলেন। উভয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লী স্পষ্টতই বর্তমানে বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর এই চুল্লী ধ্বংসে রাজি হয় এবং দির আল জুর অভিযানের নাম দেয়া হয় দ্যা অরচার্ড। এ ব্যাপারে জর্জ ডব্লিউ বুশ তার বইয়ে লিখেছেনঃ আমরা সিরিয়ার চুল্লীতে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত কিছুদিনের জন্য নিয়েছিলাম। কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা টিমের সাথে আলোচনা করে এর বিকল্প নিয়েও কথা হয়। অতঃপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিরিয়ার প্রকল্পে হামলা চালানোর বিরোধিতা করেন। কেননা তিনি মনে করলেন, একটি স্বাধীন দেশে বোমা ফেলা হলে বিশেষ করে সিরিয়াকে সতর্ক না করে এবং বোমা ফেলার যৌক্তিকতা তুলে না ধরলে পাল্টা আঘাতের আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রেসিডেন্ট সিরিয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে গোপন অভিযান পরিকল্পনারও বিরোধিতা করেন।

পরবর্তীতে ইসরাইলী প্রেসিডেন্ট ওলমার্ট প্রেসিডেন্ট বুশকে ফোন করে সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লী ধ্বংস করতে বলেন। ওলমার্ট ও বুশের ফোনালাপের সময় ওভাল অফিসে তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস, ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনি, হ্যাডলি এবং তার ডেপুটি এলিয়ট আবরামস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কন্ডোলিসা রাইস পরিষদবর্গকে বোঝাতে রাজি হন যে, ইসরাইলের দাবি প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া উপায় নেই।

এই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও ওলমার্টের মধ্যে যে কথা হয়, তা নিম্নরূপঃ ওলমার্ট বলেন, জর্জ আমি আপনাকে সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লীতে বোমা ফেলার জন্য বলছি।

বুশঃ আমি একটি স্বাধীন দেশে বোমা ফেলার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি না। যতক্ষণ না আমার গোয়েন্দারা নিশ্চিত না হন যে, ওখানে অস্ত্র উৎপাদনের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

ওলমার্টঃ আপনার কৌশল আমার কাছে খুব বিরক্তিকর বা ডিসটারবিং মনে হচ্ছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ওলমার্ট আরও বলেন, আমি তাই করব, আমি যা বিশ্বাস করি। ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। বুস পরবর্তীতে ওলমার্টের সাহস আছে। এ কারণেই আমি লোকটাকে পছন্দ করি।

লন্ডনের সানডে টাইমস এ নিয়ে রিপোর্ট করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ওলমার্ট অতঃপর তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী এহুদ বারাক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিপ্পি লিভনির সাথে বৈঠক করেন। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানেরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সিরিয়া থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য এবং সামরিক অভিযান নিয়ে কী ধরনের সিদ্ধান্ত হতে পারে তা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লী ধ্বংস করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বিরোধি দলীয় নেতা নেতানিয়াহুকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালে তিনিও কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

সিরীয় আক্রমণের তারিখ চূড়ান্ত হয় ২০০৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর রাতে। আনুষ্ঠানিক বোমা ফেলার আগের দিনের কী কী কর্মসূচী পালিত হয় সে নিয়ে রিপোর্ট করেছে সানডে টাইমস। পত্রিকাটি লিখেছে ইসরাইলের কিং ফিশার নামের আরেকটি এলিট কমান্ডো ইউনিট দির আল জুর এলাকায় পৌছায়। সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লীর কাছাকাছিতে তারা পুরো একটা দিন অতিবাহতি করে। তাদের মিশন ছিল লেসার বীমের সাহায্যে সিরিয়ার চুল্লী ধ্বংস, একই সাথে বিমান বাহিনীর জেটগুলো যাতে টার্গেটে সরাসরি আঘাত হানতে পারে। সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে রাত সাড়ে ১১টায় রামাত ডেভিট বিমানবন্দর থেকে টেন এফ-ফিকটিন জেট বিমান পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে। ত্রিশ মিনিট পরে ৩টি বিমানকে ঘাটিতে ফিরে আসতে বলা হয়। বাকী ৭টি জেট বিমানকে

তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তের দিকে যেতে বলা হয়। পরবর্তীতে তারা দক্ষিণ অভিমুখে দির আল জুর যাবে। পথে তারা একটি রাডার স্টেশন ধ্বংস করে যাতে সিরিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ে এবং বিদেশি বিমানের আগমনকে চিহ্নিত করতে না পারে। এক মিনিটের মধ্যে বিমানগুলো দির আল জুর এলাকায় পৌঁছে যায় এবং সতর্কতার সাথে ক্যালকুলেটেড দুরত্বে অবস্থান নেয়। তারা আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে। আধা টন ওজনের বোমা মারে। ইসরাইলকে ধ্বংস করার জন্য সিরিয়া যে আনবিক বোমা বানাচ্ছিল ইসরাইলের হামলার মুখে মুহূর্তের মধ্যে তা ধ্বংস হয়ে গেল।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ওলমার্ট সিরিয়ার পাল্টা আক্রমণ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোগানের সাথে যোগাযোগ করে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের প্রতি একটা বার্তা পাঠান। ওলমার্ট যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন তাহলো সিরিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোন ইচ্ছে ইসরাইলের নেই। কিন্তু তার দ্বারপ্রান্তে তিনি আণবিক বোমার অধিকারী সিরিয়াকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

ওলমার্টের এই পুনঃ প্রতিশ্রুতির কোন দরকার ছিল না বলে প্রমাণিত হয়েছে। বোমা ফেলা শেষে সিরিয়া পুরোপুরি নিশ্চুপ ছিল। সরকারি তরফ থেকে একটি বাক্য পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। ঐ দিন বিকাল ৩টায় সিরিয়ার বার্তা সংস্থা একটা সরকারি ভাষ্য প্রচার করে। এতে বলা হয়, ইসরাইলি যুদ্ধ বিমান রাত একটার দিকে সিরিয়ার আকাশীমায় প্রেনিট্রেড করে। সিরিয়ার বিমান বাহিনী তাদের বাধ্য করে ফিরে যেতে। ইসরাইল একটা মরু এলাকায় বোমাবর্ষণ করে। এতে অবশ্য কোন প্রাণহানি হয়নি এবং কোন যন্ত্রপাতিরও ক্ষতি সাধিত হয়নি।

বিশ্ব মিডিয়া এই সময় জানার জন্য উদ্যেগী হয়ে ওঠে যে, মোসাদ কী করে সিরিয়ার আনবিক কেন্দ্রের ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করতে পারল তা জানতে। এবিসি টেলিভিশন রিপোর্ট করে যে, সিরিয়ার চুল্লীর অভ্যন্তরেই মোসাদ গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিল অথবা কোন প্রকৌশলীর মাধ্যমে মোসাদ এই দুর্লভ ছবি-ভিডিও সংগ্রহ করেছে।

২০০৮ সালের এপ্রিলে অর্থাৎ সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লীতে ইসরাইলের বোমা ফেলার প্রায় সাত মাস পরে মার্কিন প্রশাসন অবশেষে ঘোষণা করে যে, সিরিয়া উত্তর কোরিয়ার সহযোগিতায় পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করছে এবং এই প্রকল্প শান্তিপূর্ণ কোন কাজে নির্মিত হচ্ছে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিরিয়ার চুল্লীতে ইসরাইলের বোমাবর্ষণের ঘটনায় ওলমার্টের প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠেছেন বলে প্রতীয়মান হল। কেননা, ২০০৬ সালে লেবাননের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধে ওলমার্টের ব্যাপারে আস্থা হারিয়েছিলেন বুশ। বুশের ধারণা ছিল তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল ইসরাইল। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা কংগ্রেসম্যান সিনটরদের পরমাণু কেন্দ্রের ছবি, স্লাইড ইত্যাদি দেখালে তারা বিস্মিত হন। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কাঠামো ও চুল্লীর সাথে সিরিয়ার প্রকল্পটির শতভাগ মিল।

ইসরাইল সিরিয়ার পরমাণু প্রকল্পে বোমা ফেলার বিষয়টি সপ্তাহ দু'য়েক গোপন রাখতে সক্ষম হলেও এবং চুল্লী ধ্বংসের কথা অস্বীকার করলেও বিরোধি দলীয় নেতা নেতানিয়াহু হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন। এক লাইভ অনুষ্ঠানে তিনি বললেন, ইসরাইলের নিরাপত্তার স্বার্থে মন্ত্রিসভা যে সিদ্ধান্ত নেয় আমি তাতে পূর্ণ সমর্থন দেই। সিরিয়ার হামলার ব্যাপারে আমি একজন অংশীদার। প্রথম থেকেই আমি সিরিয়ার হামলার ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি।

সিরিয়ার পরমাণু প্রকল্পের শেষ অধ্যায় রচিত হয় ২০০৮ সালের ২ আগষ্ট। সিরিয়ার তারতাস পোর্ট থেকে সামান্য দূরে একটি বীচ হাউসের প্রশস্ত একটি বারান্দায় ঐ দিন জাঁকজমক ডিনার পার্টি দেয়া হয়েছিল। এই ভবনটি লাগোয়া জলরাশি। এখানকার পরিবেশ অতি মনোরম এবং আরামপ্রদ। এখানে বিশালাকায় টেবিলে অতিথিরা আরাম করে বসেছিলেন। এরা সকলেই বাড়ির মালিকের ঘনিষ্ঠজন। গৃহস্থের নাম জেনারেল মো. সুলইমান।

সুলাইমান প্রেসিডেন্ট আসাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। সামরিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক কাজগুলো তিনি তত্ত্বাবধান করেন। সিরিয়ার পারমাণবিক কেন্দ্রের চুল্লীসমূহের নিরাপত্তা দেখভালের দায়িত্বও ছিল তার উপর। সিরিয়ার ক্ষমতাসীনরা সুলাইমানকে প্রেসিডেন্ট আসাদের ছায়া বলেই গণ্য করতেন। প্রেসিডেন্ট আসাদের অফিসের প্রায় লাগোয়া একটি প্রাসাদে তার অফিস।

সিরিয়ার গণমাধ্যম তার নাম খুব একটা চাউর না করলেও মোসাদ ঠিকই জানত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তিনি। ফলে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ তাকে দিবারাত্রি ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করত। সুলাইমান দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ছাত্র বাসেল আল আসাদের সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব জন্মায়। প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের প্রিয় পুত্র তিনি। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তারই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৯৪ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাসেল মারা যান। আসাদ তার ছোট ছেলে বাশারের সাথে সুলাইমানের পরিচয় করিয়ে দেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আসাদ ২০০০ সালে মারা গেলে বাশার আল আসাদ প্রেসিডেন্ট হন। বাশার সুলাইমানকে তার বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন।

কিছুদিনের মধ্যেই সুলাইমান সিরিয়ার শীর্ষ ক্ষমতার ব্যক্তিতে পরিণত হন। প্রেসিডেন্ট বাশার সিরিয়ার স্পর্শকাতর সামরিক বিষয়টি তার উপর ছেড়ে দেন। এক পর্যায়ে সুলাইমান গোয়েন্দা বাহিনী সমূহ ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে লিয়াজোর কাজ করতেন। মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে গোপনে সহযোগিতার কাজটিও সুলাইমানের হাত দিয়ে সম্পন্ন হত। হেজবুল্লাহর সাথে সুলাইমানের সরাসরি যোগাযোগ ছিল এবং হেজবুল্লাহ প্রধান ইমাদ মুগনিয়াহর সাথে প্রায়শই বৈঠক করতেন। ইসরাইল ২০০০ সালে দক্ষিণ লেবানন থেকে তাদের নিরাপত্তা জোন প্রত্যাহার করে নিলে অস্ত্র হস্তান্তরের দায়িত্ব বর্তায় সুলাইমানের হাতে। ইরান ও সিরিয়ার অস্ত্রাদি সুলাইমানই হেজবুল্লাকে দেন। বিশেষ করে দূরপাল্লার রকেটগুলো। ২০০৬ সালের দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধের সময় এরকম একটি রকেট ইসরাইলে হাইকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপে সরাসরি আঘাত হানলে ৮ জন লেবার নিহত হয়। পরবর্তীতে সুলাইমান হেজবুল্লাহকে সিরিয়ার নির্মিত ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র সরবরাহ করে। এর ফলে লেবাননে ইসরাইলের বায়ু সেনার কার্যক্রম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

সুলাইমানের আরেকটি শীর্ষ পদ করায়ত্ত ছিল। সিরিয়ান রিসার্চ কমিটির একশ সিনিয়র সদস্য ছিলেন সুলাইমান। এই কমিটির কাজ ছিল দূরপাল্লার রকেট তৈরির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্র উৎপাদন পরামর্শ দান এবং পারমাণবিক গবেষণায় উত্তর কোরিয়ার সাথে যোগাযোগ তদারকি, সেখানকার পারমাণবিক চুল্লী ও স্পেয়ার পার্টস আমদানি এবং

শিপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে সুলাইমান নির্ভরযোগ্য কর্মকর্তা ছিলেন। সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লীতে কর্মরত উত্তর কোরিয়ার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের কাজও তদারকি করতেন সুলাইমান।



হাফেজ আল আসাদ

সিরিয়ার পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংসের ব্যাপারটি সুলাইমানের জন্য ছিল বড় একটা আঘাত। প্রাথমিক শক কাটিয়ে উঠে সুলাইমান আরেকটি পারমাণবিক চুল্লী স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু সুলাইমানের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস জমেছিল যে, ইসরাইল ও মার্কিন গোয়েন্দারা তার মুন্ডু নিতে চাইছে। নতুন কিছু শুরু করার আগে সুলাইমান বেশ কিছুদিন নিজ প্রাসাদেই অবস্থান করেন। অতঃপর বীচের সেই বৃহৎ বারান্দায় তিনি বিশাল ভোজের আয়োজন করেন। এ আয়োজনের মূলে ছিল তার মানসিক চাপ কমানো।

বিশাল টেবিলের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে সুলাইমান বিশাল জলরাশি যে বীচে এসে আছড়ে পড়ছিল তা অবলোকন করছিলেন। কিন্তু দেড়শত গজ দূরে পানিতে ভাসমান নিশ্চল দুটি মানুষকে তিনি দেখতে পাননি। এই জুটির আগমন সাগর

থেকে। একটি বোটে করে তাদের সুলাইমানের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। এরা ইসরাইলি নেভাল কমান্ডো এবং শার্প সুটার। তাদের সাথে পানিতে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র। তারা ভাসতে ভাসতে সুলাইমানের বাড়ির বিপরীতে অবস্থান নেয়। তারা প্রথমে বাড়িটি পরে বারান্দায় পর্যবেক্ষণ করে। একবার টেবিলে বসা লোকদের পর্যবেক্ষণ করে তারা তাদের টার্গেটের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। জেনারেল সুলাইমান মেহমানদের মধ্যেই বসা ছিলেন।

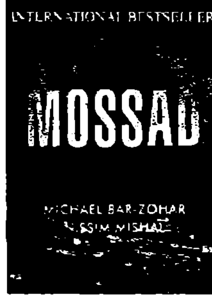
রাত ৯টায় তারা বন্দুকের নিশানা ঠিক করে। বারান্দাটা ছিল কোলাহল পূর্ণ। নিমন্ত্রণ ছাড়া আগতদের কালো ডুবুরির পোশাক। তারা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল একমাত্র জেনারেল সুলাইমানকে যেন হত্যা করা সম্ভব হয়। অন্যদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। দুই আগন্তুক কয়েক কদম এগিয়ে সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্র দিয়ে সুলাইমানের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে। তাদের গুলি ছোড়া এত ভয়াবহ ছিল যে, সুলাইমানের মাথা পেছনে হেলে যায় এবং শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে খাবার টেবিলের উপর পড়ে। অতিথিরা প্রথম দিকে কিছুই অনুমান করতে পারেননি। সুলাইমানের মাথা থেকে যখন গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছিল তখন অতিথিরা বুঝতে পারেন যে, সুলাইমানকে গুলি করা হয়েছে। কেউ কেউ সুলাইমানের সাহায্যে এগিয়ে এলেও এসব ক্ষেত্রে যা হয় তাহল অনেকেই আতঙ্কে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিলেন। ইত্যাবসরে আগন্তুক দুই আততায়ী লাপাত্তা।

সানডে টাইমস এ বিষয়ে যে প্রতিবেদন ছেপেছে তা প্রকৃত ঘটনার অনুগামী নয়। পত্রিকাটি লিখেছে শার্প সুটাররা ইসরাইলের নেভাল কমান্ডো ফ্লোটিলা ১৩ এর সদস্য। তারা সিরিয়ার উপকূলে এসেছে ইসরাইলের এক ব্যবসায়ীর প্রমোদ তরীতে করে। তারা সত্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আবার নোঙর তুলে চলে গেছে।

দামেস্কে যখন এই সংবাদটি পৌছাল তখন তা অনেকেরই মর্মপীড়ার কারণ হল। সিরিয়া সরকার বিষয়টি নিয়ে নীরবতা পালন করল এবং তেমন একটা প্রচারও পেলনা। সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। তাদের প্রশ্ন, হিট টিম কী করে টারটামে পৌছল। কেননা দামেস্ক থেকে তা ১৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। তারা পালালো ও বা কী করে? সিরিয়ায় কী এমন একটি জায়গাও নেই যেখানে তাদের নেতারা নিরাপদ নন?

কয়েকদিন পর সিরিয়া সরকার সংক্ষিপ্ততম একটি বিবৃতি পাঠায়। সেখানে বলা হয়, সুলাইমানের হত্যাকারীদের গ্রেফতারে সরকার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু আরবের অন্যান্য দেশের গণমাধ্যম সিরিয়ার এই বিবৃতির জন্য কেউ অপেক্ষমাণ ছিল না। তারা সুলাইমানকে নিয়ে লাগাতার বিশাল বিশাল এবং বিস্তারিত নিউজ ছাপতে থাকে। কারা সম্ভাব্য হত্যাকারী সে সম্পর্কেও নানারকম আভাস দেয়। বলতে কী, অধিকাংশ আরব দেশই জেনারেল সুলাইমানকে হত্যার ব্যাপারে ইসরাইলের প্রতি ইংগিত করে। সিরিয়ার পারমাণবিক কেন্দ্র আল জুর এ চুল্লী স্থাপনে সুলাইমানের নেতৃস্থানীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে।

পশ্চিমা দেশের গোয়েন্দাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্য ভিন্নতর।



তেহরানে লাশের পাহাড়

২০১১ সালের ২৩ জুলাই ইরানের দক্ষিণ তেহরানের বনি হাশেম স্ট্রীটে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে এসে দুই বন্দুকধারী এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে গুলি করে হত্যা করে। চামড়ার জ্যাকেট থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের করে হত্যা শেষে দু'আততায়ীই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। নিহত ব্যক্তির নাম দারিওইউস রেজাই নাজাদ। বয়স ৩৫। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের একজন প্রফেসর এবং ইরানের গোপন পারমাণবিক কর্মসূচির একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা।

ইরানের রেজাই নাজাদই প্রথম ইরানি বিজ্ঞানী নন যিনি এভাবে আততায়ীর হাতে খুন হলেন। সরকারি তকমা লাগিয়ে ইরান শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু টেকনোলজির উন্নয়নে ব্রতী ছিল। ইরান দাবি করে আসছিল, রাশিয়ার সহযোগিতায় তারা যে বুশহর চুল্লি নির্মাণে ব্রতী ছিল তার লক্ষ্য ছিল সৎ। কিন্তু এই বুশহর চুল্লির আড়ালে গোপনে ইরান পারমাণবিক আরও বেশ কিছু কার্যক্রম চালাচ্ছিল। ঐ চুল্লিতে ইরান শক্তিশালী প্রহরার অধীনে কাজ চালাত এবং সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল এককথায় কঠিন। সময়ের পরিবর্তনে ইরান তাদের আরও বেশ কিছু পরমাণু কর্মসূচির কথা স্বীকার করেছিল।

যদিও শুরুতে তারা পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ ও উন্নয়নের কথা অস্বীকার করেছিল। যদিও পশ্চিমা গোয়েন্দারা এবং ইরানের কিছু আন্ডার গ্রাউন্ড সংস্থা অভিযোগ করে আসছিল যে, ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইরানের প্রথম

পরমাণু বোমা বানানোর কাজে রত। এক্ষেত্রে একটাই পথ ছিল নৃশংস অভিযান চালিয়ে ইরানের গোপন পরমাণু কর্মসূচির কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করে দেয়া।

২০১০ সালের ২৯ নভেম্বর। সময় সকাল পৌনে আটটা। স্থান উত্তর তেহরান। ইরানের পরমাণু প্রকল্পের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মজিদ শাহরিয়ার গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। এ সময় তার গাড়ির পেছনের উইনশিল্ডে হেলমেট পরা মোটরসাইকেল আরোহণী ছোট্ট একটি যন্ত্র বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মুহূর্তের মধ্যে সে ডিভাইস বিস্ফোরিত হল। ৪৫ বছর বয়সী ড. মজিদ নিহত এবং তার স্ত্রী আহত হন। একই সময় দক্ষিণ তেহরানে আরেক মোটরসাইকেল থেকে ড. ফেরদাউন আব্বাসী দাভানীর গাড়িতে অনুরূপ ডিভাইস প্রতিস্থাপন করা হলে সেটিও বিস্ফোরিত হয় এবং ড. আব্বাসী ও তার স্ত্রী আহত হন। ড. আব্বাসী হলেন আরেকজন পরমাণু বিজ্ঞানী।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ইরান সরকার ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে দায়ী করে। উল্লেখ্য, এই দুই বিজ্ঞানী অত্যন্ত গোপনে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইরানের পরমাণু প্রকল্পের প্রধান আলী আকবর সালেহী নিহত শাহরিয়ারকে 'শহীদ' আখ্যা দিয়ে বলেন, তারা মহৎ কাজের সাথেই যুক্ত ছিলেন। আর তা হল মানব কল্যাণ। সালেহী পারমাণবিক প্রকল্পের বিষয়টি এড়িয়ে যান।

ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেজাদ নিহত দুই বিজ্ঞানীকে অসম্ভব প্রতিভাধর আখ্যায়িত করে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। ইতিমধ্যে ডঃ আব্বাসী আরোগ্য লাভ করলে আহমেদিনেজাদ তাকে ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেন।

ইরানের বিজ্ঞানীদের যারা হত্যা করছিলেন তাদের পরিচয় কখনোই জানা যায়নি।

২০১০ সালের ১২ জানুয়ারি। সকাল সাড়ে ৭টা। উত্তর তেহরানের শরীয়তী স্ট্রীটের বাসা থেকে বের হয়ে গাড়ির লক খুলছিলেন প্রফেসর মামুদ আলী মোহাম্মদী। তার গন্তব্যস্থল ছিল শরীফ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি।

যখনই তিনি তার গাড়ির লক খুলছিলেন তখন ভয়ংকর এক বিস্ফোরণে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। নিরাপত্তা বাহিনী এসে দেখতে পায় মোহাম্মদীর গাড়ি বিধ্বস্ত এবং প্রফেসর মোহাম্মদীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। পরে জানা গেল, প্রফেসর মোহাম্মদীর গাড়ির সাথেই লাগোয়া একটি মোটরসাইকেলে ব্যাপক পরিমাণ বিস্ফোরণ রাখা হয়েছিল। ইরানী গণমাধ্যম এবার তারস্বরে বলতে থাকে যে, মোসাদ এজেন্টরাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেজাদ ঘোষণা করেন যে, এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ইহুদিবাদী প্রক্রিয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়।



ইরানের কয়েকজন পরমানু বিজ্ঞানী

৫৫ বছর বয়সী প্রফেসর মোহাম্মদী ছিলেন বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী এবং ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের একজন উপদেষ্টা। ইউরোপীয় মিডিয়া তাকে ইরানের রেভ্যুলেশনারী গার্ডের একজন সদস্য হিসেবে অভিহিত করে। এরা সরকারেরই প্যারালাল একটি সামরিক সংগঠন। কিন্তু প্রফেসর মোহাম্মদীর জীবন ও মৃত্যুর রহস্যাবৃত ঘটনার মত পরিচয়ও রহস্যেঘেরা। মোহাম্মদীর বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের ভাষায়, মোহাম্মদী মূলত গবেষণাকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। সামরিক বাহিনীর কোন প্রকল্পে বা সংস্থার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন

না। আবার কেউ কেউ একথাও বলেছেন ইরান সরকারের ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং সরকার বিরোধি কর্মকাণ্ডেও তিনি অংশ নিয়েছেন।

তবে একথা অনস্বীকার্য, প্রফেসর মোহাম্মদীর শেষকৃত্যে অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেকই ছিলেন রেভ্যুলেশনারি গার্ডের সদস্য। রেভ্যুলেশনারি গার্ডের অফিসাররা তার কফিন বহন করেন। তদন্ত শেষে অবশেষে যা জানা যায় তাহলো প্রফেসর মোহাম্মদী ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীর সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন।

২০০৭ সালের জানুয়ারীতে ড. আরদাশির হোসেনপুরকে হত্যা করা হয়। এ সময় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে, তেজস্ক্রিয় বিষ দিয়ে ইসরাইলের গোয়েন্দা বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। লন্ডনের সানডে মেইল টেক্সাসভিত্তিক স্টার্টকর স্টাটেজি এন্ড ইন্টেলিজেন্স থিংক ট্যাংকের বরাত দিয়ে এই খবরটি প্রকাশ করে। ইরান সরকার এই রিপোর্টটিকে নিয়ে উপহাস করে। তাদের ভাষ্য, মোসাদের পক্ষে ইরানের অভ্যন্তরে এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা অসম্ভব এবং কখনোই সম্ভব নয়। ইরানী কর্মকর্তারা বলেন যে, প্রফেসর হোসেইনপুর তার বাড়িতে এক অগ্নিকাণ্ডের সময় ধোয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। ইরান আরও গুরুত্ব দিয়ে জানায় যে, প্রফেসর হোসেইনপুর কখনোই ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি একজন বিখ্যাত তড়িৎ চুম্বক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় যে, প্রফেসর হোসেইনপুর ইসফাহান সিক্রেট ইনস্টলশেনে কাজ করতেন। সেখানে অপরিশোধিত ইউরোনিয়াম গ্যাসে পরিণত করা হত। এই গ্যাস ইরানের ভূগর্ভস্থ নানতাজ কেন্দ্রে পারমাণবিক গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যবহৃত হত। এই কেন্দ্রটি শক্তিশালী ও দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মৃত্যুর দু'বছর আগে হোসেইনপুরকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে অবদানস্বরূপ ইরানের সর্বোচ্চ খেতাব প্রদান করা হয়েছিল। সামরিক গবেষণায় ব্যাপক সাফল্যের জন্য তাকে এই খেতাব দেয়া হয়েছিল।

ইসরাইল তথা মোসাদের কথিত সমর নীতির ক্ষেত্রে ইরানের দু'চারজন বিজ্ঞানীকে খতম করার বিষয়টি কিঞ্চিৎকর ঘটনাই বটে। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার মতে, দাগানের মোসাদ বাহিনী হিট টিম, স্যাকটাস গ্রুপ,

ডাবল এজেন্ট নিধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পে ধস নামাতে বছরের পর বছর ধরে সাফল্যের সাথে কাজ করেছে।

স্টার্টফরস এর বিশ্লেষক বিভাগের পরিচালক রেভা ভাল্লা বলেছেন, আমেরিকার সহযোগিতায় ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পে মানব সম্পদ ধ্বংস ও নিষ্ক্রিয় করণের পাশাপাশি ইরানের সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধ্বংসে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেছে। রেভা ভাল্লা বলেন, আশির দশকের শুরুতে ইরাকের ক্ষেত্রেও ইসরাইল অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে। তখন মোসাদ ইরাকের তিনজন পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছিল। বাগদাদ সন্নিহিত অসরিক পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণে ইরাককে তখন পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।



ড. আবদুল কাদির খান

ইরানের পারমানবিক প্রকল্প বিলম্বিত করতে মোসাদ পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে দাগানের মোসাদ বাহিনী নৃশংস পন্থা বেছে নিয়েছিল। দাগানের মোসাদ বাহিনী চেয়েছিল ইরান যাতে কোন ভাবেই একটি

পারমাণবিক বোমা বানাতে সমর্থ না হয়। জন্মের পর থেকেই ইসরাইল তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিল। ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেজাদ এই বলে সতর্কও করেছিলেন যে, ইসরাইলের বিলুপ্তি তিনি ঘটাবেন।

বিজ্ঞানীদের হত্যা করে মোসাদ কিছুটা বিজয়ীর বেশে বটে। কিন্তু মোসাদের প্রায়শ্চিত্ত করার মত উদাহরণও বিদ্যমান। ইরানের গোপন পারমাণবিক প্রকল্প ও এর অবকাঠামো ও পাওনাদির বিস্তারিত উদঘাটনে মোসদের ব্যর্থতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

সত্যি বলতে কী, কয়েক বছরের ব্যবধানে ইরান পারমাণবিক প্রকল্পে যে অনেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে ইসরাইল বা মোসাদ তার হদিশ সামান্যই অবহিত। পারমাণবিক প্রকল্পে ইরান প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক সংখ্যক বিজ্ঞানীকে নিয়োগ দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, ইরান গোপন পারমাণবিক বেস প্রতিষ্ঠা করেছে। সফিসটিকেট পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে। অথচ ইসরাইল বিস্তারিত বা গভীরের কিছু জানে না। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল, পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে ইরানের ছলাকলা, কৌশলাদি পশ্চিমা গোয়েন্দাদেরও বোকা বানিয়ে চলেছে। মোসাদতো অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত।

ইরানের রেজা শাহ পাহলভী ১৯৭০ সালে শান্তিপূর্ণ ও সামরিক প্রয়োজনে দুটি পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু রেজা শাহের পারমাণবিক প্রকল্প ইসরাইলকে বিন্দুমাত্র দুঃশ্চিন্তায় ফেলেনি। কেননা ইরান ছিল তখন ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র। ১৯৭৭ সালে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আইজার ওয়েইজম্যান তেলআবীবে ইরানের জেনারেল হাসান তৌকানিনের সম্মানে একটা পার্টিরও আয়োজন করেছিলেন। জেনারেল হাসান ইরানের সামরিক বাহিনী আধুনিকায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ইরান ও ইসরাইল মিত্র দেশ। ইসরাইল ইরানকে তখন অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত। দুই দেশের মিত্রতার কারণে ঐ সময় তাদের মধ্যে যে অতিগোপনীয় বৈঠকটি হয় তার বিবরণ পাওয়া গেছে। ইসরাইলের ওয়েইজম্যান তখন ইরানকে বিশেষ ধরনের শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের অফার করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ড. জুমম্যান তখন বলেছিলেন, তারা যে ক্ষেপণাস্ত্র ইরানকে রফতানি করার অফার দিয়েছেন তাতে পারমাণবিক ওয়ারহেড

সংযোজন সম্ভব। একথা শুনে ইরানী মন্ত্রী তৌ ফানিয়ান খুবই চমৎকৃত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল এই যে, এসব অস্ত্র সরবরাহের আগেই ইরানে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। ইরানের নতুন রেভ্যুল্যুশানি সরকার রেজা শাহের সমর্থকদের প্রায় নিশ্চিৎ করে ফেলে। নতুন সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায় ইসরাইলের সর্বাত্মক বিরোধিতা। ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী রেজা শাহ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং তদস্থলে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হন আয়াতুল্লাহ খোমেনি। দেশের শাসনভার বর্তায় খোমেনির সমর্থক মোল্লাদের উপর।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেই পারমাণবিক প্রকল্প ইসলাম বিরোধি আখ্যা দিয়ে খোমেনী সবগুলো পারমাণবিক প্রকল্প বন্ধ করে দেন। যে ভবনে পারমাণবিক চুল্লী ছিল তা বন্ধ এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু ১৯৮০ সালে ইরান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেন। যুদ্ধে ইরানের জাত শত্রু ইরাকের পক্ষে অপ্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার খোমেনীকে মারাত্মক ক্ষুব্ধ করে তোলে।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী অবশেষে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। এমনকী খোমেনীর মৃত্যুর আগেই তার উত্তরসূরী আলী খামেনী তার সামরিক বাহিনীকে নতুন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও সংগ্রহের নির্দেশ দেন। তিনি রাসায়নিক এবং পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও সংগ্রহের ওপরও গুরুত্ব দেন। আর এসব অস্ত্র বানানোর উদ্দেশ্য ছিল ইরাক যেসব বিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে ইরানীদের হত্যা করেছে তার পাল্টা জবাব দিতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ। ইরানের এই বিপ্লবীরাই এক সময় পারমাণবিক অস্ত্র ইসলাম বিরোধি বলে ফতোয়া দিয়েছিল। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র প্রকল্প হাতে নিয়ে তারা তাদের ফতোয়াগুলো উল্টে দিলেন।

ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পে অর্থায়ন ও মনোযোগ প্রদর্শনের বিষয়টি আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই খন্ডিতভাবে প্রকাশ হতে শুরু করেছিল।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। এ সময় ইউরোপে কান পাতলেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারটি শোনা যেত। বেকার সাবেক সোভিয়েত সেনাদের কাছ

থেকে পারমাণবিক বোমা, ওয়ারহেড ইরানীরা কিনেছে বলে বেশ গুজব ছিল। আর অর্থলোলুপ সাবেক সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ইরানে নানা অস্ত্রশস্ত্র টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছে বলেও ব্যাপক প্রচারণা ছিল। পশ্চিমা পত্র-পত্রিকা প্রায়শই লিখত যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানী ও জেনারেলরা তাদের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে এবং ইরান সরকার তাদের চাকুরী দিচ্ছে। রিপোর্টার তার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত প্রতিবেদনে এও লিখত যে, ইউরোপ থেকে তালাবদ্ধ ট্রাকের পর ট্রাক মধ্যপ্রাচ্যে চলে যাচ্ছে। এই সময় রাশিয়া ইরানের বুশহারে একটি পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। দুটি ছোট মাপের চুল্লী প্রতিষ্ঠায় চীন ইরানের মধ্যে চুক্তি হয়েছে বলে খবর বেরোয়।

দুটি খবরই আমেরিকা ও ইসরাইলের ঘুমকে হারাম করে দেয়। তারা ইউরোপে গোয়েন্দা পাঠায় এবং নির্দেশ দেয়, সত্যি সত্যি ইরান রুশদের পারমাণবিক বোমা কিনেছে কীনা এবং তাদের বিজ্ঞানীদের এ কাজে নিয়োগ দিয়েছে কিনা। কিন্তু গোয়েন্দারা তা উদঘাটনে ব্যর্থ হলেও রাশিয়া ও চীনের ওপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করে আমেরিকা। যাতে তারা ইরানের সাথে চুক্তি বাতিল করে। মার্কিন চাপে চীন ইরানের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে। রাশিয়া ইরানের সঙ্গে চুক্তি বহাল রাখে কিন্তু গতি বিলম্বিত করতে শুরু করে। শর্ত হয় ইরানের পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণে কুড়ি বছরেরও বেশী সময় লাগবে এবং তা পুরোপুরি রাশিয়া ও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে থেকে সীমিত আকারে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এবং আমেরিকার সিআইএ অনুধাবনে ব্যর্থ হল যে, তাদের বোকা বানিয়েছে চীন ও রাশিয়া। কেননা ইরান ইতিমধ্যে সকলের অজান্তে বিশালাকায় একটি পারমানবিক প্রকল্প চালু করেছে।

১৯৮৭ সালে দুবাইয়ে একটি গোপন সভা হয়। একটি নোংরা অফিসে ৮জন মানুষ বৈঠক করেন। এদের মধ্যে তিনজন ইরানী, ২জন পাকিস্তানী এবং তিনজন ইউরোপের বিশেষজ্ঞ– যাদের মধ্যে দুজন জার্মান। এরা প্রত্যেকেই ইরানের পক্ষে কাজ করছিল।

এ দিনের সভায় ইরান ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে গোপন চুক্তি হয়। পাকিস্তানীদের প্রচুর টাকা-পয়সা দেয়া হয়। আরও স্পষ্ট করে বললে,

পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্পের প্রধান ড. আব্দুল কাদের খান সভাতে উপস্থিত ছিলেন এবং মোটা অংকের টাকা তার হস্তগত হয়।

এই বৈঠকের বেশ কয়েক বছর আগে পাকিস্তান তাদের পারমাণবিক প্রকল্প চালু করে। পাকিস্তানের টার্গেট তাদের চিরশত্রু ভারতকে দমিয়ে রাখা। ড. কাদের একটি পারমাণবিক বোমা বানাতে সহজে বিদারন সম্ভব এমন সামগ্রী পাগলের মত খুঁজছিলেন। তিনি প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করতে চাইছিলেন না। তার কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল উচ্চমাত্রার ইউরেনিয়াম।

পাকিস্তানের পরমাণু বোমার জনক ড. আবদুল কাদের খান পরমাণু বোমার ব্লুপ্রিন্ট ইউরোপীয় কোম্পানী ইউরেনকো থেকে চুরি করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি সেখানে কাজ করতেন। সেই সূত্রেই তিনি পাকিস্তানে পারমাণবিক বোমা বানাতে শুরু করেন। কাদের খান কিছুদিনের মধ্যে আজরাইলে নিজেকে রূপান্তরিত করেন। কেননা তিনি আনবিক বোমার মেথড, ফর্মূলা এবং পরমাণু বোমা বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করতে শুরু করেন। ইরান তার প্রধান খদ্দেরে পরিণত হয়। লিবিয়া এবং উত্তর কোরিয়া তার খদ্দের ছিল।

ইরানীরা কাদের খান ছাড়াও অন্য সূত্র থেকে পারমাণবিক বোমা বানাতে প্রয়োজন এমন সরঞ্জামাদি কিনতে শুরু করে। ইরানীরা স্থানীয়ভাবে এসব কীভাবে তৈরি করতে হয় তাও শিখে ফেলে। বিশাল পরিমাণ ইউরেনিয়াম, সেন্ট্রিফিউজ, বৈদ্যুতিক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ নানা পথে ইরানে আসতে শুরু করে। অপরিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম কার্যকর করতে বিশালাকার অবকাঠামো নির্মাণ করে ইরান। ইরানী বিজ্ঞানীরা পাকিস্তান এবং পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞরা ইরানে গোপনে ব্যাপক হারে যাতায়াত শুরু করে। ধূর্ত ইরানীরা সব ডিম এক ঝাঁকায় রাখায় ব্যাপারে সতর্ক ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানের সামরিক ঘাঁটি ছাড়াও ছদ্মবেশী ল্যাবরেটরী কিম্বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে তারা পারমাণবিক কর্মসূচি চালাতে অবকাঠামো গড়ে তোলে। কয়েকটি স্থাপনা তারা ভূগর্ভে স্থাপন করে। একটি পারমাণবিক প্লান্ট ছিল ইসফাহানে, আরেকটি আরাকে। নানতাজে সেন্ট্রিফিউজ সুবিধাসম্বলিত স্থাপনা গড়ে তোলা হয়। পবিত্র শহর কোমে আরেকটি প্লান্ট গড়ে তোলা হয়। জানাজানি হলে ইরানীরা প্ল্যান্টগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। ধরা পড়া এড়াতে প্রয়োজনে মাটির স্তর চেছে ফেলতেও তারা ভেবে রেখেছিল। ইরানীরা আন্তর্জাতিক

আনবিক এনার্জি এজেন্সীকেও দক্ষতার সাথে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকী এই সংস্থার চেয়ারম্যান মিশরের ড. মো. আল বারাদিকেও তারা মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল। ফলে ইরান নির্বিঘ্নে পারমাণবিক কর্মসূচী চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ১জুন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মত পারমাণবিক ক্ষেত্রে ইরানী আয়োজনের প্রকৃত ব্যাপ্তি ও বিশালতা অনুধাবনে সক্ষম হয়। নিউইয়র্কে পাকিস্তানের পক্ষত্যাগী এক বিজ্ঞানী এফবিআই অফিসে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বিস্তারিত অবহিত করেন। একই সাথে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চান। ভদ্রলোক নিজেকে ড. ইফতেখার খান চৌধুরী বলে পরিচয় দেন। ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পে পাকিস্তান কীভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন বিজ্ঞানী ইফতেখার। ইফতেখার কাদের খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নিয়েছেন বলে এফবিআইকে জানান।

ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পে পাকিস্তানের কোন কোন বিশেষজ্ঞ শরীক হয়েছিলেন সে নামের তালিকাও ড. ইফতেখার এফবিআইকে দেন। ড. ইফতেখারের তথ্য উপাত্ত এফবিআই তদন্ত করে সত্যতা পায়। এফবিআই ড. ইফতেখারকে আমেরিকায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয় রাজনৈতিক অভিবাসী হিসেবে। এফবিআই ড. ইফতেখারের তথ্যাদি অবহেলা ভরে ফেলে রাখে। এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ যেমন নেয়নি তেমনি ইসরাইলকেও সতর্ক করেনি। এভাবে চার বছর কেটে যায়। কিন্তু এক সময় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

২০০২ সালের আগষ্টে ইরানের বিরুদ্ধবাদী আন্ডারগ্রাউন্ড দল মুজাহিদিন আল খালক (এমইকে) আরাক ও নানতাজে ইরানের দুটি পারমাণবিক অবকাঠামোর কথা বিশ্ববাসীর কাছে ফাস করে দেয়। পরবর্তী সময়েও এমইকে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পাদি নিয়ে আরও তথ্য প্রকাশ করতে শুরু করে। সিআইএ তখনো এসব খবর নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে। সিআইএর ধারণা ছিল ইসরাইল ও রাশিয়া বিপজ্জনক অভিযান পরিচালনায় আমেরিকাকে যুক্ত করতে চাইছে। সিআই আরও ধারণা করেছিল যেহেতু মোসাদ এবং ব্রিটিশ এমসিক্সটিন এমইকে নানাভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছে অতএব তাদের দেয়া তথ্য নির্ভূল এবং বিশ্বস্ত। ইসরাইলি সূত্রমতে প্রকৃত সত্য হল

মোসাদের একজন অফিসার ইরানের বিশালাকায় চুল্লীর সন্ধান পায় নাতনজেতে। এটি মরুভূমির গভীরে অবস্থিত। একই বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে ইরানের আন্ডারগ্রাউন্ডের এক নেতা সিআইএকে একটি ল্যাপটপ দেয়। এতে ঠাসা ছিল ইরানের পারমাণবিক নানা তথ্য। আন্ডারগ্রাউন্ডের ঐ নেতা অবশ্য কীভাবে এই ল্যাপটপ তার হস্তগত হল তা উল্লেখ করেননি। সিআইএ পরীক্ষা করে দেখল যে, একটি তথ্য স্ক্যান করে সম্প্রতি ল্যাপটপে ঢোকানো হয়েছে। সিআইএ কিছু তথ্য অগোছালো ও অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য মোসাদকে দায়ী করল। যদিও সিআইএ জানত যে, এসব তথ্যাদি মোসাদ তাদের নিজস্ব সূত্র থেকে পেয়েছে। পরবর্তীতে আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন এমইকে তা সরবরাহ করে। উদ্দেশ্য হল পশ্চিমা দুনিয়া যাতে ইরানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের ডেস্কে ইরানের উল্লেখিত প্রকল্পের ব্যাপারে নানা তথ্য এসে জমা হচ্ছিল। এসব দেখে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। ড. কাদের খানের পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবসা নিয়েও বিশ্বব্যাপী নানা গালগল্প ও গুজব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অবশেষে ক্রন্দনরত ড. খান পাকিস্তানী টিভির পর্দায় আবির্ভূত হন। সেখানে তিনি স্বীকারোক্তি দেন যে, তিনি পারমাণবিক বোমার ফর্মূলা ইত্যাদি লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং ইরানকে সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন।

এক পর্যায়ে ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত সূত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এখানে মোসাদের মেইর দাগানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়।

দাগান মার্কিন গোয়েন্দাদের নিত্য নতুন তথ্য দিতে শুরু করে। এর মধ্যে ছিল কোম নগরীতে ইরান কীভাবে পারমাণবিক প্রকল্প গড়ে তুলছে সে তথ্যও। ইসরাইলি গোয়েন্দারা বেশ কয়েকজন রেভ্যুলেশনারি গার্ড ও পারমাণবিক প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে স্বপক্ষে ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিল বলেও ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়। মোসাদ সংশ্লিষ্ট দেশের গোয়েন্দা ও সরকারকেও ইরানের ব্যাপারে তথ্যাদি দিয়ে অবহিত করে। ঐসব দেশকে মোসাদ সতর্ক করে যে, পারমাণবিক সামগ্রী ইত্যাদি যেন তাদের বন্দর থেকে ইরান অভিমুখে আসতে না পারে। ঐ সব জাহাজকে যেন জব্দ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত গোয়েন্দা তথ্য ইসরাইলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এদিকে মৌলবাদী ও ধর্মান্ধ ইরান প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধের কয়েকটি দেশকে ধ্বংসের ঘোষণা দিল। এক্ষেত্রে ইরানের পিছু নেওয়া ছাড়া ইসরাইলের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। ইসরাইলও ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ঠেকাতে চোরাগুপ্তা যুদ্ধ ঘোষণা করল ইরানের বিরুদ্ধে। ১৬ বছর ধরে চলা তার পূর্বসূরির অসাবধানতা ও ঔদাসীন্য মোসাদের বস দাগানের জন্য খুবই বিড়ম্বনা ও কষ্টের ছিল। ইরানের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন মোসাদের দাগান।



আয়াতুল্লাহ্ খামেনী

২০০৬ সালে মধ্য ইরানে একটি প্লেন বিধ্বস্ত হয়। সকল যাত্রীই নিহত হন। এদের মধ্যে রেভ্যুলেশনারি গার্ডের সিনিয়র সদস্যরাও ছিলেন। আহমদ কাজামি নামের ঐ সংগঠনের একজন কমান্ডারও নিহত হন। ইরান বলে, খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু স্টার্টফর গ্রুপ আভাস দেয়, পশ্চিমা গোয়েন্দারা ঐ বিমান ধ্বংসের নেপথ্যে।

এর ঠিক এক মাস আগে ইরানের একটি সামরিক পরিবহন বিমান তেহরানের একটি বাড়ির উপর ধসে পড়ে। যাত্রী ছিল ৯৯। সকলেই নিহত হন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সরকার অনুগত রেভ্যুলেশনারি গার্ডের অফিসার এবং সরকারপন্থি সাংবাদিক। ২০০৬ সালের নভেম্বরে আরেকটি সামরিক বিমান তেহরানে উড্ডয়নকালে বিধ্বস্ত হয়। এতে রেভ্যুলশনারি গার্ডের ৩৬ সদস্য

নিহত হয়। ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ ঘটনার জন্য আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করেন।

ইতিমধ্যে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কর্মকর্তা দাগান ইরানের ক্ষেত্রে তার দেশের কর্মকৌশল নির্ধারণে প্রধানতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যান। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইরানকে দমাতে সর্বাত্মক যুদ্ধই অনিবার্য। তবে তিনি সেই রণকৌশল শেষ ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।

নাশকতা শুরু হয় ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া ডাইলাম পারমাণবিক কেন্দ্রে একটা বিস্ফোরণের খবর দেয়। ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে এই বিপর্যয় বলে বলা হয়।

একটা অচিহ্নিত বিমান থেকে ঐ মিশাইল ছোঁড়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। একই মাসে বুশহারে আরেকটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। রাশিয়া নির্মিত একটি পারমাণবিক চুল্লীতে এখান থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হত। পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র পারচীনে আরেকটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই কেন্দ্রটি ইরানীদের কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইরানে সরকার বিরোধি আন্ডারগ্রাউন্ড নেতারা দাবি করেন, বিস্ফোরণে এই গোপন ল্যাবরেটরির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

২০০৬ সালের এপ্রিলে ইরানের কেন্দ্রীয় পরমাণু কেন্দ্র উৎসবমুখর ছিল একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান এবং ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রসমূহের প্রধানরা ভূগর্ভস্থ ঐ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই কেন্দ্রে হাজার হাজার সেন্ট্রিফিউজ চব্বিশ ঘন্টা ধরে মন্থন করা হত। উৎসব মুখর এই অনুষ্ঠানে ইরানীরা পারমাণবিক ক্ষেত্রে আরেকটি সাফল্যের ঘোষণা দিতে যাচ্ছিল।

নতুন আরেকটি পারমাণবিক কাসকেড উদ্বোধনী লগ্নে সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। প্রধান প্রকৌশলী কাসকেড উদ্বোধনের বোতাম টিপলেন। কিন্তু ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ সংঘটিত হল। কেঁপে উঠল বিশালাকায় চেম্বার। পাইপগুলো কানে তালা লাগানো আওয়াজ তুলে খণ্ড বিখণ্ড হতে লাগল। উপসংহার হল পুরো কেন্দ্রই ধ্বংস হয়ে গেল।

ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের প্রধান অজানা শত্রুদের কারসাজি উল্লেখ করে এই ভয়াবহ ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সাজার আওতায় আনার দাবি জানান। তিনি বলেন, এই অজানা লোকগুলোই ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার করেছিল কোন জায়গায়। সিবিএস টিভি সেন্ট্রিফিউজ বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে জানায় যে, উদ্বোধনের পূর্বে ক্ষুদ্র মাত্রার একটি বিস্ফোরণে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। সিবিএস আরও জানায়, নানতাজ বিস্ফোরণের নেপথ্যে ছিল ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনী। ইসরাইলিরা এক্ষেত্রে মার্কিন গোয়েন্দাদের সহযোগিতা দিয়েছিল।

২০০৭ সালে জানুয়ারিতে আবার ইরানী সেন্ট্রিফিউজ সফিসটিকেটেড অন্তর্ঘাতের সম্মুখীন হয়। পশ্চিমা গোয়েন্দারা ইস্টার্ন ইউরোপীয়ান কোম্পানী খোলে। এসব কোম্পানির মালামাল কিনতে শুরু করে ইরানীরা। ইরানের সেন্ট্রিফিউজে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় যা রক্তনালীর মত কাজ করে তা এই মার্কেট থেকে কেনা হয়। কেননা ইরানের উপর জাতিসংঘের অবরোধ চলার কারণে খোলাবাজার থেকে তা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে ইরানকে মালামাল ক্রয়ে বোগাস এবং ভুয়া ইস্টার্ন ইউরোপীয় কোম্পানীর শরনাপন্ন হতে হয়। এসব কোম্পানী রুশ ও ইরানী এক্সাইলরা পরিচালনা করত আর এরা গোপনে পশ্চিমা গোয়েন্দাদের হয়ে কাজ করত। এসব যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের পর ইরানীরা বুঝতে পারে তারা ধোঁকায় পড়েছে। কেননা ঐ সব যন্ত্রপাতি ত্রুটিপূর্ণ এবং ব্যবহার অযোগ্য।

২০০৭ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এক গোপন নির্দেশে সই করেন। ঐ নির্দেশে তিনি সিআইএকে যেকোন মূল্যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বিলম্বিত কিম্বা বিঘ্ন সৃষ্টির কথা বলেন। এই সিদ্ধান্তের পর পশ্চিমা গোয়েন্দারা ইরান যাতে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল না পায় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়। আগষ্টে মোসাদের দাগান আমেরিকার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিকোলাস বার্নসের সাথে সাক্ষাৎ করে ইরানের ব্যাপারে তার কর্মকৌশল তুলে ধরেন। স্যাবোটাজ, বিস্ফোরণ, অন্তর্ঘাত গত সাত বছর ধরে ইরানকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। বুশহার চুল্লীর কুলিং সিস্টেম ঠিকমত কাজ না করার বিষয়টি ছিল রহস্যাবৃত। যে কারণে প্রকল্পটি শেষ করতে দু'বছর দেরি হচ্ছিল। ২০০৮ সালের মে মাসে আরাক কেন্দ্রটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চমাত্রার

নিরাপত্তা প্রাপ্ত ইসকাহান পারমাণবিক কেন্দ্রটিও ভয়ংকরভবে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



রেজা শাহ পাহলভী

২০০৮ ও ২০১০ সালে নিউইংর্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, টিনারস নামের একটি কোম্পানী ইরান ও লিবিয়ার পারমাণবিক কেন্দ্র ধ্বংসে জড়িত। কোম্পানিটি সুইজারল্যান্ডের। এই পরিবারের সকলেই প্রকৌশলী। তারা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে সিআইএকে সহযোগিতা করেছে এবং সিআইএ এ কাজে তাদেরকে ১০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। সুইস সরকার এই পরিবারের প্রতি যাতে কোন মোকদ্দমা না করে সেজন্য সিআইএ নেপথ্য থেকে কাজ করেছে। কেননা পারমাণবিক স্থাপনার জন্য অবৈধ পথে যন্ত্রপাতি সরবরাহের দায়ে ঐ কোম্পানীর বিরুদ্ধে কঠিন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যেত। ঐ প্রকৌশলী পরিবারের পিতা ফ্রেডোরিক টিনার এবং তার দুই ছেলে উরস এবং মার্কো ইরানের নানতাজ পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। এর ফলেই ৫০টি সেন্ট্রিফিউজ ধ্বংস হয়েছিল।

টিনার পরিবার প্রেসার পাম্প কিনেছিল জার্মানির ফেইফার ভ্যাকুয়াম কোম্পানি থেকে। সর্বশেষ বিক্রি করা হয় ইরানে।

টাইম ম্যাগাজিন দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করে যে, আর্কটিক সাগরের একটি জাহাজ ছিনতাইয়ে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদই জড়িত। ঐ জাহাজটি ফিনল্যান্ড থেকে আলজেরীয়া যাচ্ছিল। রুশ ক্রুরা জাহাজটি চালাচ্ছিল। বলা হচ্ছিল জাহাজটি কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রার দুদিনের মাথায় ২০০৯ সালের ২৪ জুলাই জাহাজটি ৮ছিনতায়ী তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এক মাস পর রাশিয়া দাবি করে যে, ছিনতাই করা জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ আবার রুশ কমান্ডোরা গ্রহণ করেছে। লন্ডন টাইম এবং ডেইলি টেলিগ্রাফ উল্লেখ করে যে, মোসাদই এই তথ্য রাশিয়াকে দিয়েছে। দাগানের লোকেরা জানিয়েছে যে, ঐ জাহাজে ইউরোনিয়াম ভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাশিয়ার সাবেক এক সামরিক কর্মকর্তা এই ইউরোনিয়াম ইরানীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে পাইরেসির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন এডমিরাল কোওটস। তিনি টাইম ম্যাগাজিনকে নিজের থেকেই জানান যে, ঐ জাহাজ মোসাদের লোকজন হাইজ্যাক করেছিল। জাহাজ ভর্তি ইউরেনিয়াম যাতে গন্তব্যে পৌঁছতে না পারে সে লক্ষ্যেই এই ছিনতাই।

ইরানের প্রতি এই অব্যাহত আক্রমণের প্রেক্ষাপটে তারাও নিশ্চুপ বসে ছিল না। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ইরান অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে কোমের কাছে নতুন একটি পারমাণবিক অবকাঠামো তৈরি করে। তারা এখানে তিন হাজার সেন্ট্রিফিউজ স্থাপনের পরিকল্পনা করে। আর এটি ছিল ভূগর্ভস্থ কেন্দ্র। ২০০৯ সালের মাঝামাঝি ইরান উপলব্ধি করে যে, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইসরাইল তাদের কোম পারমাণবিক স্থাপনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

ইরান চালাকি এবং তড়িঘড়ি করে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রকে তাদের কোম পারমানবিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব জানান দেয়। কয়েকটি সূত্র জানায়, ইরান পশ্চিমা এক গোয়েন্দাকে সম্ভবত ব্রিটিশ এমসিক্সটিনের লোক আটক করতে সমর্থ হয়। ঐ গোয়েন্দা কোম সম্পর্কিত বিশ্বাসযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিল। ইরান

তাদের মর্যাদা রক্ষা ও বদনাম এড়াতে কোম পারমাণবিক কেন্দ্রের অস্তিত্বের জানান দেয়।

ইরানী ঘোষণার এক মাস পর সিআইএর পরিচালক লিয়োন প্যানেট্টা টাইম পত্রিকাকে জানান যে, তারা তিন বছর ধরেই ইরানের কোম পারমাণবিক কেন্দ্র সম্পর্কে অবহিত এবং মোসাদই তা উদঘাটনে সমর্থ হয়।

কোম পারমাণবিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব উদঘাটনে মোসাদ, সিআইএ এবং এমসিক্সটিন যে জড়িত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। ফরাসী সূত্র মতে, উল্লেখিত তিনটি গোয়েন্দা সংস্থা এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করত এবং ইরানের ভেতরে অভিযান চালাতো মোসাদ।

২০১০ সালের বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের সাথে মোসাদ জড়িত ছিল। এতে একটি প্লান্টের ১৮ ইরানি টেকনিশিয়ান নিহত হন। জাগরোস মাউন্টেনস নামের এই প্লান্টে শোহাব নামের মিসাইল এসেম্বেল করা হত। ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের সাথে নিয়ে মোসাদ ৫জন পরমাণু বিজ্ঞানীকে গুম বা হত্যা করে।

আমেরিকা, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সাথে মোসাদের অতিরিক্ত সখ্যতা গড়ে ওঠার পেছনের মানুষটিরও মেইন দাগান। মোসাদের পরিচালক হয়েই তিনি বিদেশি গোয়েন্দাদের সাথে সখ্যতা বৃদ্ধির নির্দেশ দেন। দাগানের উপদেষ্টারা অবশ্য এই ধারণার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু দাগান তাদের পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। বরং উপদেষ্টাদের তিনি বলতে গেলে শাসন এবং অধীনস্থ গোয়েন্দাদের বিদেশি গোয়েন্দাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার কঠোর নির্দেশ দেন।

ব্রিটিশ ও আমেরিকার গোয়েন্দাদের পাশাপাশি দাগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোর্স ছিলেন ইরানের বিরোধি দলের নেতারা। দাগান তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাদি খুবই আস্থায় নিতেন। ইরানের বাইরে ইরানের ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর রেসিট্যান্সের নেতারা প্রথা বহির্ভূতভাবে প্রায়শই সাংবাদিক সম্মেলন করতেন। এসব সাংবাদিক সম্মেলনে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের সাথে যুক্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নাম প্রকাশ করা হত। এরকম এক বিজ্ঞানী হলেন মোহসীন ফখরী জাদেহ।

৪৯ বছর বয়সী এই বিজ্ঞানী তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়র পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাকে রহস্যজনক ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করে থাকে ইরান সরকারের বিরোধিরা। কিন্তু রেসিট্যান্ট গ্রুপ তার ব্যাপারে বিস্তারিত ফাঁস করে দেয়। এর মধ্যে একটি তথ্য হল ১৮ বছর বয়স থেকেই ফখরী রেভিলুশনারি গার্ডের সদস্য। তার ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর, বাসাসহ যাবতীয় ফোন নম্বর ফাস করা হয়। ফখরী যথার্থই একজন নামী বিজ্ঞানী। শেহাব ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়ারহেডে পারমাণবিক বোমা প্রতিস্থাপন, বোমার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ উদ্ভাবনে তার টিম খুবই দক্ষ।

উল্লেখিত কারণে ফখরীকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভিসা দিতে অপরাগতা জানায়। বিদেশে তার ব্যাংক একাউন্ট ফ্রোজ করা হয়। ইরান সরকার বিরোধীরা ফখরীর সঙ্গে বিজ্ঞানীদের নাম-ধাম যেমন প্রকাশ করে তেমনি তার গোপন ল্যাবরেটরীর অবস্থানও প্রকাশ করে। এর ফলে আর বুঝতে বাকী থাকে না মৃত্যুদণ্ডের তালিকায় ফখরীর অবস্থান কী। আর এর একটা বিকল্প আছে। তাহল ফখরী যদি নিজ দেশ ও দল ছেড়ে পশ্চিমের কোন দেশে আশ্রয় নেন।

জেনারেল আলী রেজা আসগারী ইরানের সাবেক প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইস্তাম্বুল সফরকালে তিনি গুম হয়ে যান। ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের সাথে তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইরানী গোয়েন্দারা পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে তারা খোঁজেনি। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার চার বছর পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর সালেহী জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এই বলে নালিশ করেন যে, জেনারেল আসগারীকে মোসাদ গুম করে ইসরাইলের কারাগারে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্ট ভিন্নতর। সেখানে বলা হয়েছে স্বপক্ষ ত্যাগ করে তিনি পশ্চিমে আশ্রয় নিয়েছেন। তাকে স্বপক্ষ ত্যাগে মোসাদ যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে এবং তুরস্কে তার নিরাপত্তায় দায়িত্বেও ছিল মোসাদ।

অন্য একটি সূত্র মতে, জেনারেল ফখরী ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পাদি নিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সিআইএকে সরবরাহ করেছেন।

জেনারেল আসগারীর অন্তর্ধানের এক মাসের মধ্যে ২০০৭ সালের মার্চে ইরানের আরেক সিনিয়র অফিসার গুম হন। আমীর সিরাজী নামের এই কর্মকর্তা রেভ্যুলেশনারি গার্ডের এলিট ফোর্স হিসেবে পরিচিত আল কুদস ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। ইরানের সীমান্ত এলাকার অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ইরানী একটি সূত্র লন্ডন টাইমসকে জানায় যে, আসগারী ও সিরাজী গুম হওয়ার সময়ই মোহাম্মদ সোলতানী নামের আরেক ইরানী কর্মকর্তাকে গুম করা হয়। সোলতানী রেভিলুশনারি গার্ডের একজন কমান্ডার ছিলেন এবং তার কর্মস্থল ছিল পারস্য উপসাগরে।

২০০৯ সালের জুলাইয়ে পরমাণু বিজ্ঞানী শাহরাম আমিরীও দেশ ও স্বপক্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। আমিরী কোম পারমাণবিক কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। সৌদি আরবে হজ করতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। ইরান সৌদি আরবের কাছে আমিরীর সন্ধান চেয়ে কড়া চিঠি লেখে। কয়েক মাস পরে আমিরী আমেরিকায় উদয় হন।

আমিরী ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ফাঁস করে দেন। এজন্য তাকে ৫০ লক্ষ ডলার, নতুন পরিচয় এবং আমেরিকার আরিজোনায় একটি বাড়ি করে দেয়া হয়। সিআইএ দাবি করে আমিরী তাদেরসহ পশ্চিমাদের পুরনো এজেন্ট এবং আমিরী তাদেরকে ইরানের পরমাণু কেন্দ্র সম্পর্কে অরিজিনাল ও বাস্তবিক নথিপত্র হস্তান্তর করেছেন।

এক বছর আমেরিকার বসবাসের পর আমিরী তার মন পরিবর্তন করেন। আবার তিনি ইরানে ফিরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি আসলে আমেরিকায় অস্থিরতার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন। বাস্তবতার সাথে তিনি নানা কারণে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। বাড়িতে একটা ভিডিও বানিয়ে তিনি তা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেন।

তাতে তিনি বলেন, সিআইএ তাকে অপহরণ করেছিল। এর কিছু সময় পর তিনি আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেন। তিনি এতে বলেন, প্রথম ভিডিওতে প্রদত্ত তার বক্তব্য সঠিক নয়। কিছু সময়ের ব্যবধানে তিনি তিন নম্বর ভিডিওটি প্রকাশ করে বলেন তার দুই নম্বর ভিডিওর বিষয়বস্তু সঠিক নয়।

আমিরী আমেরিকায় অবস্থিত পাকিস্তানের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং সেখানে ইরানের স্বার্থ পাকিস্তানেই দেখভাল করত। তিনি তাকে ইরানে ফেরত পাঠাতে পাকিস্তানকে বলেন। পাকিস্তান তাকে সহযোগিতা করে।

২০১০ সালের জুলাই মাসে আমিরী তেহরানে ফিরে আসেন। তেহরানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমিরী জানান যে, সিআইএ তাকে অপহরণ করেছিল এবং তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে। এরপর তিনি হাওয়া হয়ে যান। পর্যবেক্ষকরা সিআইয়ের ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ করেন। কিন্তু সিআইএ বলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমিরীর কাছ থেকে পেয়েছি আর ইরান পেয়েছে আমিরীকে। এখন আপনারাই বলুন, ইরান না আমেরিকা জিতল!

ইরানও প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মরীয়া হয়ে উঠছিল। ২০০৪ সালে ডিসেম্বরে ইরান ইসরাইল ও আমেরিকার পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য ১০জনকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে তিনজন তাদের পারমাণবিক কেন্দ্রে কাজ করত। ২০০৮ সালে ইরান ঘোষণা করে যে, তারা মোসাদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। ইরান আরও জানায় যে, মোসাদ তিন ইরানীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। ২০০৮ সালের নভেম্বরে ইরান ৪৩ বছর বয়স্ক আশতারীকে ফাঁসি দেয়। ইসরাইলের পক্ষে তার গোয়েন্দাগিরি করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। বিচার চলাকালে আশতারী জানান, ইউরোপে তিনজন মোসাদ গুপ্তচরের সাথে তিনি বৈঠক করেছেন। মোসাদ আশতারীকে নগদ অর্থ ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী দেয়।

২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বর তেহরানের এভিন কারাগারে সরকার আরেকজন গোয়েন্দাকে ফাঁসি দেয়। তার নাম আলী আকবর সিদাত। সিদাত মোসাদের কাছে ইরানের সামরিক সামর্থ্য এবং রেভুলুশনারি গার্ড কর্তৃক পরিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির ব্যাপারে বিস্তারিত পাচার করে। বিগত ৬ বছর ধরেই সিদাত ইসরাইলের গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং তুরস্ক, থাইল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে মোসাদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন। এভাবে প্রতিটি মিটিংয়ে সিদাতকে তিন হাজার থেকে সাত হাজার ডলার দেয়া হয়। ইরান ঘোষণা দেয়, এরকম আরও গ্রেফতার করা হবে।

কিন্তু ২০১০ সালে ইরানের পরমাণু প্রকল্পগুলোতে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে। এসব কেন্দ্রে যেসব স্পেয়ার পার্টস ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ছিল খুবই নিম্নমানের। মোসাদের পরিকল্পনার জেরেই ইরান মোসাদের নিম্নমানের কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে খুচরা যন্ত্রপাতি কিনেছিল। একে একে প্লেন দুর্ঘটনা, ল্যাবরেটরী পুড়ে যাওয়া, পারমাণবিক কেন্দ্রে ও ক্ষেপণাস্ত্রে বিস্ফোরণ, ইরানী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের দেশ ও স্বপক্ষ ত্যাগ, সিনিয়র বিজ্ঞানীদের মৃত্যু, সংখ্যালঘুদের উত্থান এবং বিদ্রোহের পেছনে ইরান মোসাদকে দায়ী করে আসছিল। ইরানের এই ধারণা সঠিক বা বেঠিক যাই হোক, ইরান কিন্তু সন্দেহের চোখে মোসাদকেই এক নম্বরে রেখেছিল। আর মোসাদ মানেই সেই দাগান।

ইউরোপীয় গণমাধ্যম একটি ঘটনাকে দাগানের অভ্যুত্থান হিসেবে অভিহিত করে। ২০১০ সালের গ্রীষ্মকালে ইরানের পরমাণু কেন্দ্রের হাজার হাজার কম্পিউটার উল্টা-পাল্টা আচরণ করতে শুরু করে। এই কম্পিউটারগুলো দিয়ে পারমাণবিক কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত। স্টাক্সনেট নামক এক ভাইরাসে কম্পিউটারগুলো আক্রান্ত হয়। অথচ কম্পিউটারগুলো ছিল খুবই দামী ও অত্যাধুনিক। নাতাজের সেন্ট্রিফিউজ নিয়ন্ত্রণ করত। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পর্যবেক্ষকরা ক্ষতির পরিমাণ দেখে মন্তব্য করলেন, এ এক ভয়াবহ সাইবার এ্যাটাক এবং আমেরিকা ও ইসরাইল এর সাথে যুক্ত।

প্রেসিডেন্ট আহমদাদিয়ানেজাদ ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেখাতে চাইলেন এবং বললেন, তারা নিজেরাই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু প্রকৃত সত্য ঘটনা জানা গেল ২০১১ সালের শুরুতে। জানা গেল, ইরানের পরমাণু কেন্দ্রের অর্ধেক পরিমাণ সেন্ট্রিফিউজ নিশ্চল হয়ে পড়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের টিম ইরানের পারমাণবিক প্রয়াস পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মোসাদ ক্রমাগত নানা ক্ষতির চেষ্টা করে সফলও হয়েছে। এছাড়া কূটনৈতিক চাপ, জাতিসংঘ কর্তৃক অবরোধ, বোমা তৈরির সরঞ্জামাদি ইরানের জন্য দুর্লভ করে তোলা, অর্থনৈতিক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া, মুক্ত বিশ্বের ব্যাংকগুলোকে ইরানের সাথে ব্যবসা চালাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ইরানের মধ্যে জাতি ও গোষ্ঠীগত বিরোধ উসকে দেয়া অন্যতম। ইরানে

কুর্দী, আজেরী, বেলোশিস, আরব ও তুর্কমেন জাতিরও বাস। এরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। এদের মাধ্যমেও ইরানের অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নের বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এত আয়োজন সত্ত্বেও ইরানীদের আণবিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যায়নি। এদিকে ইসরাইলের এক শীর্ষ কর্মকর্তা দাগানকে আলটিমেট জেমস বন্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

দাগান মোসাদের প্রধান পদে পদোন্নতি পান। এদিকে পর্যবেক্ষকরা ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, ২০০৫ সালের মধ্যে ইরান পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করে ফেলবে। কিন্তু এই তারিখ ক্রমশ পেছাতে থাকে।

২০০৭, ২০০৯, ২০১১ সালের ৬ জানুয়ারী দাগান যখন চাকুরী থেকে অবসর নেন, তখন তিনি জাতির উদ্দেশে বার্তা দিয়ে যান। আর সেই বার্তাটি হল, ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প অন্তত ২০১৫ সাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা গেছে। দাগান তার উত্তরসূরীর জন্যও বার্তা রেখে যান। আর তা হল, গত আট বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত করে রাখা সম্ভব হয়েছে। অনুরূপ কার্যক্রম যেন ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখা হয়। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুতেও তিনি অনুমোদন দিয়ে যাননি।

মোসাদের প্রধান হিসেবে দাগান সাড়ে আট বছর ছিলেন। মোসাদের পরিচালক হিসেবে এত দীর্ঘদিন কেউ দায়িত্ব পালন করেননি।

দাগানের স্থলাভিষিক্ত হন তামির পারদো। তিনিও মোসাদের একজন ভ্যাটার্ন অফিসার। তিনি ইয়োনি নেতানিয়াহুর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর। ১৯৭৬ সালের ইসরাইলের এনতেতের অভিযানে তিনি ছিলেন হিরো। পরবর্তীতে নানা সফল অভিযানের মাধ্যমে তামির বিশিষ্টতা অর্জন করেন। একজন দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা, নিউ টেকনোলজির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং অপ্রচলিত ও দুর্গম অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে তার বিশেষ সুনাম রয়েছে।

দাগান ক্ষমতা ছাড়ার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তৃতাও করেন। সেখানে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোসাদ বাহিনীর সাফল্য, ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেন। তিনি মোসাদের প্রতিটি সদস্যের গুণগান করেন। তিনি বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই মোসাদ সদস্যরা কাজ করে থাকেন। তবে তার কার্যকালে একটি বিশেষ ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করেন। ইসরাইলী সেনা সদস্য গিলাদ

শালিতকে হামাস কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেই স্থান চিহ্নিত করতে তিনি তার ব্যর্থতার কথা বলেন। গিলাদকে পাঁচ বছর ধরে হামাস লুকিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে হামাস তাকে মুক্তি দেয় বটে কিন্তু তার বিনিময়ে একশত ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীকে মুক্তি দিতে হয় ইসরাইলকে।

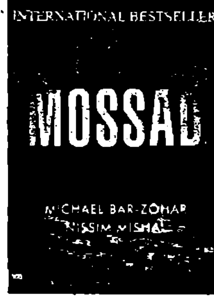
উল্লেখিত ব্যর্থতা সত্ত্বেও দাগানকে শ্রেষ্ঠতম মোসাদ কর্মকর্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইহুদি জাতির পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানান। বক্তৃতা শেষে নেতানিয়াহু গভীর আলিঙ্গনে দাগানকে আবদ্ধ করেন। আরেকটি অনন্য সাধারণ ঘটনা হল, ইসরাইলি মন্ত্রিসভা দাগানের প্রতি সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লেখেন দাগানকে। সেখানে তিনি দাগানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দাগানের জন্য প্রকৃত প্রশংসাসূচক ঘটনা ঘটেছিল অবসর নেয়ার এক বছর আগে। মিসরীয় পত্রিকা আল আহরাম-এর একটি প্রতিবেদনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আলী আহরাম পত্রিকা বরাবরই ইসরাইল বিরোধি। ইসরাইলের জন্য তারা বরাবরই ক্ষতিকর এবং উগ্র। এই পত্রিকায় ২০১০ সালের ১৬ই জানুয়ারী সুপরিচিত সাংবাদিক আশরাফ আবু আল হাউল মোসাদ এবং দাগান নিয়ে ঐ নিবন্ধনটি লেখেন। সেখানে তিনি লেখেন, ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প বহু আগেই সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। ইরানীরা ভাল করেই জানে তাদের পরমাণু বিজ্ঞানী মাসুদ আলী মোহাম্মদীর মৃত্যুর পেছনে কার হাত বিদ্যমান।

ইরানের প্রতিটি শীর্ষ নেতা ভাল করে একটি নাম জানেন যিনি সকল অঘটনের কেন্দ্রবিন্দু। আর সেই নামটি হল দাগান। আবার সাধারণ লোকের কাছে মোসাদের প্রধান হিরো দাগানের নামটা তেমন পরিচিত নয়। দাগান কাজ করেন শান্ত পদক্ষেপে, নিবিষ্ট মনে এবং গণমাধ্যম থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। কিন্তু সাত বছর ধরে ইরান সরকারের কাছে ছিলেন বিভীষিকা হিসেবে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীর অগ্রগতি তিনি রুখে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মিসরীয় পত্রিকার ওই সাংবাদিক আরও লেখেন মধ্যপ্রাচ্যে মোসাদ অনেক দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনার জন্য দায়ী। বিশেষ করে সিরিয়া, হেজবুল্লাহ, হামাস এবং ইসলামিক জেহাদের বিরুদ্ধে দাগানের কৌশল ও কৃতিত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। মিসরীয় সাংবাদিক আল হাওল তার লেখার উপসংহার টানেন এভাবে, সব কৃতিত্বের মূলে দাগান। দাগানকে ইসরাইলের সুপারম্যান হিসেবে অভিহিত করা যায়।

১৯৪৮ সালে যখন মোসাদের জন্ম তখন ইসরাইলের এই সিক্রেট সার্ভিসে কোন সুপারম্যান ছিলেন না। তখন গুপ্তচরবৃত্তিতে কিছুটা অভিজ্ঞ লোকদের মোসাদে জড়ো করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই এই ত্যাগ ও চোরাগুপ্তা হামলায় পারদর্শী বর্ধনশীল এই সংস্থাকে নানা রকম সহিংসতা অর্ন্তকোন্দল, নিষ্ঠুরতা এবং হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি মোকাবেলা করতে হয়েছে।



সিরিয়ার কুমারীরা

১৯৭১ সালের বিক্ষুব্ধ একটি রাত। ইসরাইলের একটি নেভী মিসাইল বোট ভূমধ্যসাগরের বিক্ষুব্ধ জলরাশি অতিক্রম করে করে সিরিয়া উপকূলের দিকে যাচ্ছে। বিশালাকায় বন্দর হাইকো ত্যাগ করেছে অপরাহ্নে। লেবানন উপকূল অতিক্রম করে সিরিয়ার জলরাশিতে ঢুকেছে জাহাজটি। বাতিবিহীন জাহাজটি আলো ঝলমল লাতাকিয়া বন্দরটি পাশ কাটিয়ে উত্তরমুখী হয়ে চলছে। অবশেষে জাহাজটি মানবশূন্য একটি বীচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে নোঙ্গর করল। এটি তুরস্কের সীমান্তের কাছেই। ফ্লোটিলা থার্টিনের নেভাল কমান্ডারের আগমন ঘটল এবং তিনি রাবারের কয়েকটি ডিঙি পানিতে নামালেন।

যখন তাদের যাত্রার সময় হল তখনই কয়েকটি কেবিনের দরজা খুলল। তিনজন মানুষ বেসামরিক পোশাকে বেরিয়ে এলেন। তাদের মুখমন্ডল ছককাটা কাপড় দিয়ে আবৃত। ওয়াটারটাইট ব্যাগে তারা রেখেছে জাল পাসপোর্ট, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, গুলিভর্তি রিভলবার। কোন রকম কথা না বলেই তারা ডিঙিতে ঝাঁপ দিল এবং বীচের দিকে যাত্রা শুরু করল। এই কমান্ডোদের বলা হয়নি কেন তাদের সিরিয়া নিয়ে আসা হয়েছে। এদিকে সন্ধ্যা আগত। বরফ জমা পানিতে তারা সাঁতার কেটে বীচের দিকে যাচ্ছিল। তারা উপুড় হয়ে সাঁতার কাটছিল যতক্ষণে না একজন কাঙ্খিত লোকের আবির্ভাব না ঘটল। বাকী পথটুকু সাঁতার কেটে আগন্তুকের সাথে যোগদান করল। আগন্তুকের নাম ইয়োনাটান। কোড নাম 'প্রোসপার'। এ হল দলের নেতা। নেতা ওদের তিনজনের জন্য গরম কাপড় নিয়ে এসেছেন।

কনকনে ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা তিন লোক সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাপড় পাল্টালো। কাছে থাকা একটি গাড়িতে তাদের তোলা হল। গাড়ি চালাচ্ছিল মোসাদেরই স্থানীয় এক সাহায্যকারী। গাড়ি সুন্দরভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় গাড়িটি সিরিয়ার হাইওয়েতে ওঠে গেল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা দামেস্কে গেল।

তারা দুটি হোটেলে উঠল। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমাল। অতঃপর তারা সিরিয়ার রাজধানী পরিদর্শনে বেরুল। এরা প্রত্যেকেই সাবেক ফ্লোটিলা থারটিনের কম্যান্ডো। বর্তমানে মোসাদ এজেন্ট। এরা যে ধরনের অভিযানে অংশ নিত – এবারেরটি তেমন নয়। অনেকটা অস্বাভাবিক। এদের মধ্যে একজনের নাম ডেভিল মোলাড।

এবারকার এই অভিযানের পরিকল্পনা করা হয় মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মোসাদের সদর দফতর তেলআবিবে। মোসাদ প্রধান জভি জমির, কায়েসায়ের প্রধান মাইক হাসরি প্রমুখ চারজন তরুণের সাথে এই বৈঠক করেন। তরুণদের বয়স ২৩-২৭। এই চারজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সাথে বহু অভিযানে অংশ নিয়েছে। সকলেরই জন্ম উত্তর আফ্রিকায়। চমৎকার ফ্রেঞ্চ ও আরবী বলতে পারে। জমির তাদেরকে ব্রিফ করা শুরু করেন। দু'বছর আগে সিরিয়া থেকে একটা বার্তা আসে। মৃতপ্রায় ইহুদী সম্প্রদায় নেতাদের পাঠানো হাফেজ আল আসাদ সিরিয়ার ইহুদীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাচ্ছেন–এই ছিল বার্তা। ১৯৭০ সালে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতায় আরোহী হাফেজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় আধমরা ইহুদী সম্প্রদায়।

বহু ইহুদী কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সিরিয়া ত্যাগ করেছে বটে কিন্তু কতিপয় পুচকে ও বর্ষীয়ান ইহুদীরা আটকে আছে সিরীয়ায়। তরুণ সম্প্রদায়ও সিরীয়া থেকে পালিয়েছে। ফলে রয়ে গেছে কুমারী তরুণীরা। এখন কে তাদের বিয়ে করবে- এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই কুমারী মেয়েগুলো যদি পালিয়ে ইসরাইল যেতে পারে তবে তাদের ঘর সংসার হবে।

জামির ব্রিফিংয়ে কোসা নসট্রাকে জানালেন, কয়েকটি মেয়ে লেবানন হয়ে ইসরাইল যেতে চেষ্টা করেছিল। তারা স্মাগলারদের শরণাপন্ন হয়েছিল তাদের টাকাও দিয়েছিল। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি আবার ধরা পড়ে অবর্ণনীয়

নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কয়েকটি ইহুদী মেয়ে বৈরুতে যেতে পেরেছে বটে কিন্তু তাদেরকে সেখানে একটা সেফজোনে আটক করে রাখা হয়েছে। স্থানীয় মোসাদ সহযোগীরা তাদের কিছুটা সাহায্য করে বটে। কবে তারা ইসরাইল গিয়ে পৌছাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। ১৯৭০ সালের শীতের এক রাতে ১২জনের অধিক ইহুদী মেয়েকে স্থানীয় জেলেরা ইসরাইলের একটি জাহাজে তুলে দিয়েছিল। যা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

পরিকল্পিত এই উদ্ধার পর্বের জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন কর্ণেল আব্রাহাম। এই উদ্ধার কাজ পরিচালনার আগে কর্ণেল আব্রাহাম এবং তার লোকেরা কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মেয়েগুলোকে যে দক্ষতার সাথে জাহাজে তোলা হয়েছিল তা ছিল অভূতপূর্ব। মেয়েদের জাহাজে তুলেই খুব দ্রুতগতিতে জাহাজ চালিয়ে তিনি ইসরাইলে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্বল্প সময়ে জাহাজ নিয়ে ইসরাইলে পৌছে কর্নেল আব্রাহাম এক মহিলাকে উপস্থিত দেখে অবাক হন। এই মহিলা হলেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার। অকুস্থলে সামরিক বেসামরিক শীর্ষ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। গোল্ডা মায়ার উদ্ধারকৃত মেয়েদের জন্য পার্টির আয়োজন করেন। সকলের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের জীবন কাহিনী শুনে চমকে যান।

কর্নেল আব্রাহামের অবসরের পরবর্তী কয়েক বছরে আমনোন গোনেন পূর্বসূরীর অনুরূপ বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিকল্পনা করেন। তিনি সিরিয়ার আটকেপড়া বহু ইহুদী মেয়েকে বিভিন্ন রুটে ইসরাইলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তবে সিরীয়া লিবিয়ার সীমান্ত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে আরব চোরাচালান ও জেলেদের বিশ্বাস করাও কঠিন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার তার গোত্রের মেয়েদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। তিনি মোসাদ প্রধান জামিরকে নির্দেশ দিলেন, যেকোন মূল্যে সিরীয়ায় বসবাসরত ইহুদী মেয়েদের ফিরিয়ে আনার।

কোসা নস্ট্রার চারজনের সাথে মোসাদ প্রধান জমির বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, ওরা সিরিয়ার নাগরিক কিন্তু ঐ ইহুদী মেয়েদের উদ্ধারের দায়িত্ব তোমাদের। এটাই তোমাদের এসাইনমেন্ট।

জমিরের নির্দেশের পরও প্রবল বিতর্কের সূচনা হয়। কেউ কেউ প্রায় চীৎকার করেন, মোসাদ এজেন্টের জন্য এ কাজ নয়। ইহুদী এজেন্টগুলোকে বরং এই কাজে দায়িত্ব দেয়া হোক। আরেক কর্মকর্তা বেজায় ক্ষ্যাপ্পা হয়ে বলেন, মোসাদ কোন ঘটকালির সংগঠন নয়। একাজে মোসাদ গোয়েন্দারা কেন জীবনের ঝুঁকি নেবে। কেননা আরবরা নিষ্ঠুর জাতি। তাদের মোকাবেলা করা খুবই কঠিন কাজ। কয়েকটি ইহুদী কুমারী মেয়ের পাত্রের অভাবে বিয়ে হচ্ছে না বলে এত বড় ঝুঁকি মোসাদ নিতে পারে না।

মোসাদ প্রধান এতসব বিতণ্ডার পরও ভড়কে গেলেন না। তিনি বললেন, শত্রু দেশে আটক ইহুদী সম্প্রদায়কে রক্ষা এবং তাদের উদ্ধার মোসাদের কার্যতালিকায় রয়েছে। মোসাদের জন্মলগ্ন থেকেই তারা এ ধরনের কাজ করে আসছে।



ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার

মোসানসম্ত্রা সিরিয়ার ভূখণ্ডে পা দেয়ার দ্বিতীয় দিন থেকেই চাঙ্গা। তারা দামেস্কের রাস্তায় গড়াগড়িয়ে চলছে, ফ্রেন্স ভাষায় গল্পগাথা করছে। তবে তারা

তাদের আশপাশে খেয়াল রাখছে। কেউ তাদের ফলো করছে কীনা সে ব্যাপারেও তারা সতর্ক। বিশেষ করে সিরীয়ার দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা বিভাগ মুখাভারা তাদের পিছু নিয়েছে কীনা তা লক্ষ্য করছে। এরই মধ্যে মোসাদ এজেন্টরা একটা আলোঝলমল মার্কেটের সোনার দোকানে যায়। তারা দোকানে গিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায়ই সোনা নিয়ে আলোচনা করছিল। এমন সময় দোকানের মালিক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হিব্রু ভাষায় বলেন, তোমরা তো আমাদেরই লোক। কথাটা সত্যি কীনা।

এজেন্টরা সোনার দোকানের মালিকের কথায় হকচকিয়ে যায়। তাদের আশংকা হয়, যদি তাদের সাজসজ্জা কথাবার্তায় ছদ্মবেশ ভাবটা ফুটেই না ওঠে, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত। দোকানির কথায় কান না দিয়ে তারা দ্রুত সটকে পড়ে।

ইহুদী সম্প্রদায়ের কুমারী মেয়েদের কানে একথা চলে যায় যে তাদের উদ্ধারে চেষ্টা চলছে। উদ্ধারকৃত একটি কুমারী মেয়ে পরবর্তীতে জানায় যে, তাদের বিয়ের জন্য খুব চাপ দেয়া হত। কিন্তু তারা কাকে বিয়ে করবে? কোন পাত্রই তো নেই। তার ভাষায়, আমরা বহু গুজব-গুঞ্জন শুনে আসছিলাম। কীভাবে আমাদের ইসরাইল নেয়া হবে। আমরা ইহুদীদের ভূমিতেই চলে যেতে চাই।

ইহুদী মেয়েদের উদ্ধারে ব্যাপৃত দলটির নাম প্রোসপার। গোপনে তাদের হাতে একটি বার্তা পৌছে দেয়া হল। এতে বলা হয়, তোমাদের হোটেলের কাছাকাছি একটা জায়গায় ছোট্ট একটি ট্রাকে বিকেলের দিকে ইহুদী মেয়েরা থাকবে।

পরের দিন অপরাহ্নে কোসানস্ট্রা সেই ছোট্ট ট্রাকটি খুঁজে পায়। একটি অন্ধকার রাস্তায় ছাদটা ক্যানভাসে ঢাকা অবস্থায় মেয়েরা অবস্থান নেয়। মোসাদ এজেন্টরা এর আগেই হোটেল ছেড়ে দিয়ে মালামাল সাথে নিয়ে নেয়। গোয়েন্দারা দু'জন বসে গাড়ির সামনে। দু'জন বসে মেয়েদের সঙ্গে। গাড়িতে বেশ কয়েকটি মেয়ে। বয়স ১৫ থেকে কুড়ির মধ্যে। সঙ্গে একটি ছোট্ট বালকও ছিল । মোসাদ এজেন্টরা আবার তাদের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে। তারা জানত, সিরিয়ার হাইওয়েতে সেনাবাহিনী কিম্বা পুলিশের মুখোমুখি হতে পারে তারা। তখন তারা কী বলবে। সিদ্ধান্ত হয়, তারা বলবে মেয়েদেরকে তারা হাইস্কুলের ফিল্ড ট্রিপে নিয়ে যাচ্ছে।

মোসাদের স্থানীয় সহযোগী যে ট্রাকটি নিয়ে এসেছে সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্থান থেকে আরও কয়েকটি মেয়েকে গাড়িতে তোলে এবং উত্তর দিকে গাড়ি চালাতে থাকে। তারা জনমানবশূন্য একটি বীচে চলে আসে। বীচ থেকে কিছু দূরে আইডিএসের একটা মিসাইল বোট অপেক্ষমাণ ছিল। মোসাদ এজেন্টরা ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে বোটটিকে ইংগিত করে। রেডিওয়েতেও তাদের বার্তা পাঠান হয়।

হঠাৎ করেই চারদিক থেকে গোলাগুলির শব্দ হতে থাকে। মোসাদ সদস্যরা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারে গোলাগুলির লক্ষ্যবস্তু তারা নয়। এখন প্রশ্ন হল, কারা গোলাগুলি করছে। সিরিয়ার পুলিশ কী ইসরাইলের ফ্লোটিলার ডিঙ্গিগুলোকে দেখতে পেয়েছে? ন্যাভাল কমান্ডোর চীফ গাদী ক্রল ইসরাইলকে রেডিও মারফত জানান।


ইসরাইলের এক তরুণী

তারপরও তিনি থেমে থাকেননি। তিনি ফ্রোটিলা ডিঙ্গিতে কল করে উত্তরের দিকে যেতে বললেন। এই বিকল্প বীচটি আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়েছিল। একই সাথে মোসাদের গোয়েন্দারা মেয়েদেরকে ট্রাকে তুলে ফেলল এবং উত্তরাভিমুখে রওয়ানা দিল। আবার যোগাযোগ করল নেভী বোটের সাথে। এই বীচটা ছিল শান্ত। কুমারী মেয়েরা এবং মোসাদের লোকজন ডিঙ্গিতে লাফ দিয়ে উঠল এবং গভীর সাগরের দিকে যেতে থাকল। দীর্ঘ সময় ধরে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর অতিক্রম করে সকলেই নেভী বোটে উঠতে সক্ষম হল। নেভী বোটটি অতঃপর ইসরাইলের পথে যাত্রা শুরু করল। মোসাদ এজেন্টরা একটা কক্ষে অন্তইত হল, মেয়েদের রাখা হল অন্যত্র। একই সাথে মেয়েদের নির্দেশ দেয়া হল সিরিয়া থেকে ফেরার ব্যাপারে যেন কারো মুখ খোলা না হয়। মেয়েগুলো সিরীয়ার দামেস্কে তাদের পরিবার-পরিজন ফেলে রেখে এসেছে। তারা ইসরাইল যাচ্ছে এই খবর জানাজানি হলে মেয়েদের বাবা মায়ের কপালে অনেক ভোগান্তি রয়েছে। এমনকী প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে। স্থানীয় এজেন্টরা ট্রাক নিয়ে ফিরে গেল দামেস্কে তাদের পরবর্তী অভিযানের লক্ষ্যে।

ইসরাইলের মিসাইল বোট কোন অঘটন ছাড়াই হাইফায় এসে পৌছল। মোসাদের লোকজনকে অন্য কাজ দেয়ার আগে মোসাদের যা বোঝা দরকার তা হল ঐ দিন বীচে গোলাগুলি কারা করেছিল পালানোর সময়। ইসরাইলের গোয়েন্দা দফতর গোলাগুলির কারণ তদন্তে সিরিয়ার গোয়েন্দা রিপোর্ট, সেনাবাহিনীর তথ্যাদি যাচাই করে কিছুই পেল না। অতপর মোসাদের অভিমত হল, এটা হতে পারে অপরিকল্পিতভাবে ওঁতপেতে থাকা রক্ষীদের গুলি অথবা পানিতে সন্দেহজনক কোন কিছুর তৎপতা দেখে নার্ভাস হয়ে সিরিয়ার সেনাদের গুলি।

পরের বার মোসাদের লোকজন প্যারিস থেকে দামেস্কে আসে প্লেনে করে । এবার তারা নিজেদের প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র হিসেবে পরিচয় দেয়। উদ্দেশ্য সিরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখা। তারা তাদের ভ্রমণ যথার্থ করে তুলতে নানারকম ভুয়া কাগজপত্র সঙ্গে রাখে। কেননা সিরিয়ার মুখাভারতা নামের গোয়েন্দা সংস্থাকে ভয় পাওয়ার মতই। ফলে মোসাদ গোয়েন্দারা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে। যদিও প্রথম রাতে তারা খুব টেনশনের মধ্যে কাটায়। কেননা ধরা পড়ে গেলেই প্রাণবধ। তারা তাদের সাহায্যকারীদের একটি

স্কোয়ারে নিয়ে যেতে বলে। কয়েক বছর আগে এখানেই শিরচ্ছেদ করা হয় ইসরাইলের সর্বোচ্চ খ্যাতিমান গোয়েন্দা এলিয়ে কোহেনকে। তার মৃত্যুদণ্ড যখন কার্যকর করা হয় কিছু লোক তা দেখে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। মোসাদের চার সদস্যের অন্যতম ক্লাউডিয়ে স্কোয়ায়ের কথা ভাবতে গিয়ে ঘুমোতে পারছিল না। মোসাদ বাহিনী ইহুদী মেয়েদের আরেকটি চালান পার করার জন্য এবারও এসেছে। কিন্তু এবারে মেয়েদের নিয়ে যেতে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল প্রচুর সংখ্যাক নিরাপত্তা রক্ষীর উপস্থিতি। মোসাদ অতঃপর ওখান থেকে মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করল। মোসাদ জায়গা বদল করল।

মোসাদ মেয়েদেরকে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে নিয়ে যেতে বলল। দূরত্ব একশত কিলোমিটার। লেবানন সীমান্ত অতিক্রম করার পর মোসাদ মেয়েদেরকে একটি বীচে নিয়ে যেতে বলল। সমস্যা হল এই এলাকাটি খ্রীষ্টান অধ্যুষিত। সময় নষ্ট না করে মোসাদ একটি ছোটখাট প্রমোদতরী ভাড়া করে ফেলল। মালিককে বলা হল এক বন্ধুকে তার জন্মদিনে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য এটি ভাড়া করা হয়েছে। এবং তারা পনের জনের মত নারী-পুরুষ প্রমোদ ভ্রমণে যাবে। বোটের ভাড়া নেয়া চূড়ান্ত হলে মোসাদ তাদের সুপেরিয়ারকে বিষয়টি অবহিত করল। একই চ্যানেলে মোসাদও বার্তার প্রত্যুত্তর পেল।

ইয়াং তরুণীদের মালামালসহ দামেস্ক থেকে ঐ রাতেই ট্রাকটি চলে এল। ক্লডিয়ে গাড়ীটি চালাচ্ছিল। লেবানন সীমান্তে ট্রাকটি থামানো হল এবং ঐসব মালামাল নামানো হল। ক্লডিয়ে তাদের কাগজপত্র দেখিয়ে ট্রাকটি পার করে নিল। ক্লডিয়ে লেবানন সীমান্তে অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে মোসাদের অন্য সদস্যরা মেয়েদের কয়েকঘন্টা অন্ধকারে হাঁটিয়ে তবে লেবানন সীমান্ত অতিক্রমে সমর্থ হল। মেয়েদের সাথে ছিল ভারী ভারী স্যুটকেস। এক পর্যায়ে সকলেই সীমান্ত হয়ে ক্লডিয়ের ট্রাকে উঠতে সমর্থ হল। মেয়েদের তোলা হল সেই প্রমোদতরীতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদতরীটি গভীর সমুদ্রের দিকে যাত্রা করল। সেখানে একটি নেভী বোটে মেয়েদেরকে তুলে দেয়া হল।

মোসাদ বাহিনী সে রাতটা বৈরুতেই কাটালো। রাতে যে পথে তারা বৈরুতে এসেছিল সেই পথেই দামেস্কে রওয়ানা হয়ে গেল। মোসাদের চার গোয়েন্দার মধ্যে শুধুমাত্র ক্লাডিয়েটেরই বৈধ কাগজপত্র ছিল। সে বৈধ পথেই ফিরে গেল।

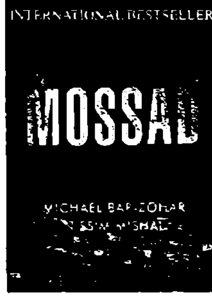
বাকী তিন গোয়েন্দা মেয়েদের নিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই সিরিয়ায় ঢুকে গেল।
পরের দিন তারা প্যারিস ফিরে গেল।

১৯৭৩ সালের এপ্রিলে সিরিয়ার কুমারী ইহুদী মেয়েদের ইসরাইলে আনার প্রক্রিয়া শেষ হয়। অভিযানের সমাপ্তি টানতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার হাইফার নৌঘাটিতে এসেছিলেন। গোল্ডা মোসাদের ক্লাডিয়েসহ তার বন্ধুদের ধন্যবাদ দিতেই হাইফা এসেছিলেন। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোসাদ এবং নৌবাহিনী সিরিয়া থেকে কুমারী ইহুদী মেয়েদের আনতে ২০টির মত অভিযান পরিচালনা করেছে। সবগুলো অভিযানই সফল হয়। প্রায় ১২০ জন তরুণকেও ইসরাইলে ফেরত আনা হয়। এই সকল অভিযানের কথা ৩০ বছর গোপন রাখা হয়।

সময় গড়াতে থাকে। ক্লাডিয়ে তার এক আত্মীয়ের বিয়েতে দাওয়াত খেতে যান। বিয়েতে কনের সাথে পরিচয় করানো মাত্র ক্লাডিয়ে তাকে চিনতে পারেন। মোসাদের টিমের কারণে সিরীয় থেকে যেসব ইহুদী মেয়ে ইসরাইলে আসতে পেরেছিল এই মেয়েটি তারই একজন। ক্লাডিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোত্থেকে এসেছ।

কনের মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল। ক্লাডিয়ে হেসে কনেকে জিজ্ঞেস করল তুমি কী সিরীয় থেকে আসনি? সমুদ্র পথে?
কনের প্রায় বেহুশ হওয়ার অবস্থা। হঠাৎ করেই কনে ক্লাডিয়ের হাতটা টেনে তাতে উষ্ণ চুমু খেতে লাগল। মেয়েটি বলল, তুমি সেই লোক। তুমিই আমাকে সেই নরক থেকে মুক্ত করে এনেছ।

ক্লাডিয়ে পরে বলেছিল, আমরা জীবনের যে ঝুঁকি নিয়েছিলাম আজ তা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।



ক্যামেরা চলছে...

২০১০ সালের জানুয়ারির প্রথমার্ধে দুটি কালো অডিমিক্স গাড়ি পার্বত্যাঞ্চলের উত্তর তেলআবিবের দেয়াল ঘেরা একটি ভবনে এসে উপস্থিত। এই ভবনটির নাম কলেজ। আসলে এটি ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার সদর দফতর। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে এই ভবনে স্বাগত জানান হল। তাকে স্বাগত জানালেন মোসাদ প্রধান মেয়ার দাগান। এই ঘটনার কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী দাগানের এক্সটেনশন এক বছর বাড়িয়েছেন।

সাম্প্রতিক কিছু সফল অভিযানের পর দাগান এবং মোসাদ বেশ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে। সিরিয়ার পারমাণবিক চুল্লী ধ্বংসও কম সাফল্য নয়। মুগানিয়া ও সুলাইমানকে হত্যাতো বিরাট একটি ঘটনা। মোসাদের সামনে তখন বড় কাজ হল ইরানের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা। এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হল একটি নাম। তার নাম আল মাবুহ। সাংবাদিক বার্গম্যানের মতে আল মাবুহকে আটক করতে মোসাদ অভিযানের নাম দেয়ে প্লাজমা স্ক্রীন।

মিটিং রুমে মোসাদ প্রধান দাগান ও সিনিয়র কর্মকর্তারা আল মাবুহকে হত্যায় তাদের পরিকল্পনা পেশ করেন। মাহমুদ রউফ আল মাবুহ হামাসের একজন নেতা এবং ইরান থেকে সিনাই প্রনালী হয়ে গাজায় চোরাচালান অস্ত্র প্রেরণের কারসাজি ও নিয়ন্ত্রণ আল মাবুহের হাতে। মোসাদের লোকজন জানান, আল মাবুহকে দুবাইয়ে হত্যা করা সম্ভব।

ইসরাইল প্রধানমন্ত্রী আল মাবুহের হত্যা পরিকল্পনার অনুমোদন দেন। সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। দুবাইয়ের একটি হোটেলে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়।

লন্ডন টাইমস জানায়, হোটেল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে মোসাদ আল মাবুহকে কী ভাবে হত্যা করা হবে তার একটি মহড়া দেয়। আল মাবুহের জন্ম ১৯৬০ সালে উত্তর গাজার জাগানিয়া শরনার্থী ক্যাম্পে। সত্তুর দশকের শেষার্ধে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগদান করেন এবং একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে যেসব আরব ক্যাফেতে জুয়াখেলা হত সেগুলো ধ্বংস করেন। ১৯৮৬ সালে একে ফোরটি সেভেন অ্যাসাল্ট রাইফেলসহ ইসরাইলি সেনার হাতে ধরা পড়েন এবং কিছুদিন পর ছাড়া পেয়ে ইজ আদদীন আল কাসেম ব্রিগেডে যোগদান করেন। এটি হামাসের সামরিক শাখা। আল মাবুহের কমান্ডার সালাহ শেহাদেহ আল মাবুহসহ হামাসের সন্ত্রাসীদের এক বিশেষ নির্দেশে যেখানেই পাওয়া যাবে ইসরাইলি সেনাদের হত্যা করতে হবে বলে নির্দেশ দেন।

১৯৮৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আল মাবুহে তার আরেক সঙ্গী নিয়ে একটি গাড়ি চুরি করেন। অতঃপর ঐ গাড়িতে তারা গোড়া ইহুদীর পোশাক পরে অভি সাসপোরটাস নামের এক ইসরাইলি সেনাকে লিফট নিতে প্রলুব্ধ করেন। অভি গাড়িতে ওঠা মাত্র আল মাবুহে পেছনে ফিরেই ইসরাইলি সেনাকে গুলি করে হত্যা করেন। ঐ সেনাকে আল মাবুহে নিজেই সঙ্গীসহ কবর দেন। অভিকে হত্যার তিন মাস পর আল মাবুহে এবং আরও কয়েকজন হামাস সদস্য আরেক ইসরাইলি সৈন্য ইনাম সাধোনকে অপহরণ ও হত্যা করেন।

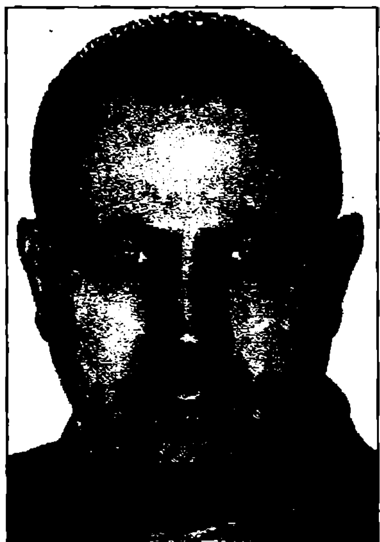
পরবর্তীতে আল জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আল মাবুহে দুই ইসরাইলি সেনা হত্যা ও তাদেরকে কবর দেয়ার সঙ্গে তার সংযুক্তির বিষয়টি প্রকাশ করেন।

ইসরাইলের দ্বিতীয় সেনাকে হত্যার পর আল মুবেহ মিশরে সটকে পড়েন। পরে যান জর্ডানে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বজায় রাখেন। গাজায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক চোরাচালান তার প্রধান কাজ হয়ে দাড়ায়। কায়রো ফিরে এলে

মিশর কর্তৃপক্ষ তাকে জেলে ঢোকায় এবং ২০০৩ সালের প্রায় পুরোটাই তিনি সে দেশের জেলে ছিলেন। পরে সিরিয়ায় পালিয়ে যান।

বর্তমানে তাকে ভয়ংকর সন্ত্রাসী বলে গন্য করা হয় এবং ইসরাইল, মিশর, জর্ডানের পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। যদিও তার বসরা তাকে একজন বড় ধরনের সংগঠক হিসেবে গন্য করে। কেননা ইরান থেকে গাজায় অস্ত্র সরবরাহের কলাকৌশলে তার জুড়ি মেলা ভার।

আল মাবুহের স্থির বিশাল ছিল যে, মোসাদ তাকে ব্যাপকভাবে খুঁজছে এবং দুই সেনাকে হত্যার ঘটনা ইসরাইল কিছুতেই মেনে নেয়নি। ভুলে যাওয়া কিম্বা ক্ষমা করে দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফরকালে আল মাবুহে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন ভূয়া পরিচয় দিতেন। ব্যবসায়ীর বেশ ও পরিচয়ে তিনি সফর করতেন। এক বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন, হোটেলে অবস্থানকালে আরাম চেয়ারে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দরজায় স্থাপন করতেন যাতে কেউ দরজা খুলতে না পারে।



মাবুহে

আল জাজিরায় আল মাবুহে যে সাক্ষাৎকার দেন সেখানে তার মুখমন্ডল ও মাথা ঢাকা ছিল। এখানে তিনি তার প্রতি হামলার বিবরণ দিয়ে বলেন, প্রতিপক্ষ তার ওপর তিন তিনবার হামলা চালিয়েছে। তারা প্রায় সফলই হতে যাচ্ছিল। এবং বিভিন্ন দেশে এই হামলা হয়। মুগানিয়াকে হত্যার অব্যবহিত পরে তার উপর হামলার চেষ্টা করা হয়। মাবুহে বলেন, যারা ইসরাইলের বিরোধিতা করে তাদের ভাগ্যে এমনটা ঘটেই চলবে।

মাবুহে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল জাজিরার ঐ সাক্ষাৎকারটি দেন। তার মনে হয়েছিল, সাক্ষাৎকার দেয়া মানে অনর্থক ঝামেলা বাড়ানো। কিন্তু হামাস নেতৃত্বের স্পষ্ট নির্দেশে তাকে সাক্ষাৎকারটি দিতে হয়। পরবর্তীতে অনেকে বলেছেন এই সাক্ষাৎকার মোসাদের জন্য তাকে খুঁজে পেতে সহায়তা করেছিল। মাবুহে ক্যামেরার সামনে আসতে রাজি হয়েছিলেন একটি শর্ত দিয়ে। আর তা হল তার মুখমন্ডল সম্পূর্ণ ঢাকা থাকবে।

সাক্ষাৎকার শেষে ঐ ভিডিও পরীক্ষার জন্য গাজায় পাঠানো হয়। কিন্তু দেখা গেল তিনি যে মুখ ঢাকতে চেয়েছিলেন তা ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাকে আবার সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। নতুন যে সাক্ষাৎকারটি নেয়া হল তা প্রচার হল না। (এটি মাবুহের মৃত্যুর পড় প্রচারিত হবে)। মাবুহে তার প্রথম ভিডিওতে কী সামস্যা ছিল জানতে চাইলেন। তাকে জানানো হল, ঐ ভিডিওটি হামাসের আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

অনেকের মতে, এই টেপ হাতছাড়া হয়ে গেলে তাকে যারা অনুসন্ধানে ব্যস্ত তারা লাভবান হবে। এই রেকর্ডিংয়ের এক সপ্তাহ পরে হামাসের এক সিনিয়র সদস্য আরবদেশ থেকে ফোন পান। ফোন কলে বলা হয় অস্ত্র চোরাচালন ও মানিলন্ডারিংয়ের কাজে দক্ষ একটি গ্রুপ তাদের সাথে যোগাযোগে আগ্রহী।

অস্ত্র পেতে মরিয়া ঐ হামাস নেতার পক্ষে ঐ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানানো অসম্ভব ব্যাপার। আলো ঝলমলে দুবাইয়ে আল মাবুহে ইরানীদের সাথে নানা বিষয়ে প্রায়শই বৈঠক করে থাকেন। তবে এই ফোন কলটি যে আল মাবুহের মৃত্যু পরোয়ানা তা বোঝা গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

আল মাবুহকে নিয়ে পুরো দৃশ্যাবলী ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছিল। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাও কাজে লাগানো হয়েছিল।

২০১০ সালের ১৮ জানুয়ারী ২৭ জন মোসাদ এজেন্ট দুবাই আসে। ১২জন আসে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে, ৪জন করে ফ্রেন্স ও অস্ট্রেলিয়ার এবং ৬জন আইরিশ। তারা দুবাইয়ের বিভিন্ন হোটেলে ওঠে।

পরের দিন বেলা ১২টার দিকে ৪৩ বছর বয়স্ক মোসাদ এজেন্ট মিশেল বোডেন হেইমার জার্মান পাসপোর্ট নিয়ে এবং তার বন্ধু জেমস লিওনার্দ ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে দুবাইতে আসে। স্থানীয় পুলিশের মতে, আল মাবুহকে হত্যার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্তদের মধ্যে এরা আগাম টিমের সদস্য।

এর এক ঘন্টা পরে ঐ দিন গেইল আসে এবং বেশী তারাকাবহুল হোটেলে হুমেরিয়ার এগার তলায় রুম নেয়। রিসিপশনে তাকে তার স্থায়ী ঠিকানা বলতে বলেছিল। মেয়েটি গড়গড় করে যে ঠিকানাটা বলে সেরকম কোন ঠিকানার অস্তিত্বই নেই।

বেলা দেড়টায় আসে কেভিন ড্যানেডরন। সে হল কমান্ডার। এসেই সে তার ডেপুটির সাথে যোগদান করে এবং হুমেরিয়ার হোটেলে ওঠে। এভাবে পৃথকভাবে আরও কয়েকজন মোসাদ এজেন্ট দুবাই চলে আসে।

সকাল সোয়া দশটায় মুবেহ দুবাইর উদ্দেশ্যে দামেস্ক ত্যাগ করে। তিনি সরাসরি এমিরেটসে চলে আসেন। দুবাইয়ে তার কাজ হল ইরানী দূতের সঙ্গে বৈঠক। অস্ত্রের আরেকটি চালান গাজা পাঠানোর লক্ষ্যেই এই বৈঠক। ঐদিন সকাল সাড়ে ১০টায় অভিযানের সমন্বয়কারী পিটার হোটেল ত্যাগ করে এবং একটি বিশাল শপিং সেন্টারে হিট টিমের সাথে দেখা করে। এদিকে মোসাদের গোয়েন্দাদের কেউ গোফ কেটে, কেউ নকল গোফ লাগিয়ে, কেউ সানগ্লাস পরে, কেউ খুলে কেউ উইগ পরে প্রস্তুতি নিতে থাকে।

বিকাল সোয়া তিনটায় আল মাবুহে দুবাই পৌছান। তার সাথে ছিল ইরাকী জাল পাসপোর্ট এবং তিনি নিজেকে টেক্সটাইল আমদানিকারক হিসেবে পরিচয় দেন। ৩টা ২৮ মিনিটে আল মাবুহ আল বাস্টন রোটনা হোটেলে ওঠেন। রিসিপশনে তিনি বদ্ধ জানালা ও বারান্দাবিহীন একটি রুম চান। তিন তলায় তাকে ২৩০ নম্বর রুম দেয়া হয়। লিফটে করে মাবুহ তার রুমে যাচ্ছিলেন সেই লিফটে টেনিস খেলোয়াড়ের পোশাক পরা দু'জন মোসাদ সদস্যও ছিল।

বেলা সাড়ে তিনটায় সোর্স বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জানায় যে, আল মাবুহে যে রুমে ঢুকেছেন তার বিপরীত দিকের রুমটা হল ২৩৭ নম্বর। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ হোটেলে আসেন পিটার যিনি অভিযানের সমন্বয়কারী। পিটার ২৩৭ নম্বর রুমটি ভাড়া নেয়। মোসাদের প্রথম গ্রুপটি বিদায় নিলে দ্বিতীয় দল আসে এবং আল মাবুহ কখন বাইরে বেরুল তা লক্ষ্য করতে থাকে। এখন হিট টিমের সকল সদস্যই আল বাস্তান রোটানা হোটেলে।

আল মাবুহে তার কক্ষ ত্যাগ করেন এবং লবি পরীক্ষা করে ধারণা পান যে, জায়গাটায় কোন ঝুঁকি নেই। অতঃপর তিনি হোটেল ত্যাগ করলে ওয়াচাররা তার পিছু নেয়। যে গাড়িতে চড়ে আল মাবুহ শহরের বাইরে যাচ্ছিলেন সে গাড়ি সম্পর্কে ওয়াচাররা কমান্ডারকে অবহিত করে। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সমন্বয়ক পিটার লবীতে প্রবেশ করে হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত জিনিসপত্র কেভিনকে দেয়।

পিটার অতঃপর ২৩৭ নম্বর রুমের চাবি সংগ্রহ করে এবং চাবি কেভিনকে দেয়। অতঃপর সে অজানা স্থানে চলে যায়। কেভিন ২৩৭ নম্বর রুমে ঢুকে সবকিছু পরীক্ষা শেষে অপেক্ষায় তাকে কখন আল মাবুহে তার রুমে ঢুকবেন।

এদিকে মুখোশ পরে কিম্বা উইগ লাগিয়ে বেশ কয়েকজন ওয়াচার হোটেলে ঢুকে পড়ে। গেইল নামের তরুণী হোটেলে পার্কিংয়ে গিয়ে হিট টিমের লোকদের হাতে কেভিনকে দেয়া পিটারের কেসটি দিয়ে আসে।

অপরাহ্ন সাড়ে ৬টায়, মোসাদ সদস্য সোর্স ওয়াটার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী লবি, কারিডোরসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। রাত ৮টা ২০ মিনিট, আল মাবুহে হোটেলে ফিরে আসেন। ২৩০ নম্বর রুমে আল মাবুহকে হত্যা করা হয়। চার আততায়ী হোটেল ত্যাগ করে।

তরুণী গেইল এবং আরেক হিট মেম্বারও হোটেল ত্যাগ করে। কেভিন ও গেইল ডাইরেক্ট ফ্লাইটে প্যারিসে চলে যায়। ইত্যবসরে সকল টিম মেম্বার বিভিন্ন গন্তব্যে চলে যায়। রাত ৮টা ৫১মিনিটে আল মাবুহকে হত্যার পরে কেভিন একবার ঐ রুমে ঢুকেছিল। বেরিয়ে সে 'ডু নট ডিস্টার্ব' লেখা সাইনটি দরজার হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে রেখে যায়।

রাত দশটা থেকে আল মাবুবের ফোনে একটার পর ফোন আসতে লাগল তার স্ত্রীর। তার এক ঘনিষ্ঠ ফোন করে আল মুবহেকে পেলেন না। টেক্সট ম্যাসেজ-কোন কিছুতেই সাড়া নেই। আল মাবুহের উদ্বিগ্ন স্ত্রী হামাসের বেশ কয়েকজনকে বিষয়টি জানালে তারা হামাসের আবাসিক প্রতিনিধিকে সেখানে পাঠালেন। ভদ্রলোক ঐ হোটেলে গিয়ে ২৩০ নম্বর রুমে ফোন করেও কোন সদুত্তর পেলেন না। অতঃপর মধ্য রাতের পর হোটেল কর্তৃপক্ষ আল মাবুহের রুমে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পান। এক ডাক্তার দেখে বললেন, হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে এই মৃত্যু।

হামাস অফিসিয়ালি এক বার্তায় বলে যে আল মাবুহের মৃত্যু মেডিকেল রিজনে হয়েছে। কিন্তু আল মাবুহের স্ত্রী মোটেই একথা মানতে রাজি নন। তিনি বলে চলেছেন, এটি হত্যাকাণ্ড। এবং মোসাদই খুনী। মৃতের রক্তের অংশবিশেষ ফ্রান্সের লেবরেটরীতে পাঠানো হল। ৯দিন পর সেই রিপোর্ট এল। অতঃপর হামাস বলল, মোসাদই আল মাবুহকে হত্যা করেছে। মোসাদের ভাষ্য প্রথমে তাকে কোন ধাতব পদার্থ দিয়ে আঘাত করে শেষে বালিশ চেপে দিয়ে হত্যা করেছে।

দুবাই পুলিশ জানায়, মৃতের শরীরে কোন বিষ পাওয়া যায়নি। দুবাই পুলিশ উপসংহারে জানায়, মোসাদ তাদের ভূখণ্ডে আল মাবুহেকে হত্যা করেছে। আল মাবুহকে হত্যার ১১দিন পর ৩১ জানুয়ারি লন্ডনের সানডে টাইমস এক প্রতিবেদনে বলে যে, মোসাদ বিষক্রিয়ার মাধ্যমে আল মাবুহেকে হত্যা করেছে। ঐ রিপোর্টার লেখেন যে, ইসরাইলের ঘাতকরা আল মাবুহের কক্ষে ঢুকে ইনজেকশনের মাধ্যমে তার শরীরে বিষ ঢুকিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। মোসাদ এজেন্ট অতঃপর রুমের সব জিনিসের ছবি তুলেছে।

২৮ ফেব্রুয়ারী দুবাই পুলিশের উপপ্রধান সাংবাদিকদের ফরাসী ল্যাবের আরও কিছু রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ফ্রান্সের ল্যাব আল মাবুহের রক্তে উচ্চমানের হাইপ্রোক্লোরাইড ব্যথানাশকের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। সার্জারীর আগে এই ধরনের এ্যানেসথেসিয়া রোগীকে প্রয়োগ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, এর ফলে পেশী ব্যাপকভাবে শিথিল ও রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। আরও জানায়, হত্যাকারীরা ভিকটিমকে এ্যানেসথেসিয়ার ঔষধ প্রয়োগ করেছে পরে

তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে। আর এই ধরনের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই গন্য হয়।

সাংবাদিক গর্ডন থোমাস মোসাদকে গালি দিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখেন। শিরোনাম ছিল 'মোসাদ লাইসেন্স টু কিল'। থমাস উল্লেখ করে যে, মোসাদ কর্তৃক অতীতের সবগুলো হত্যাকাণ্ড একই প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছে। তিনি বলেন, হিট টিমের ১১ জনের মধ্যে ৬জন ছিল মহিলা।

হারেটন ডেইলিতে ইয়োসি মেলম্যান তার প্রতিবেদনে লেখেন নিরাপত্তা ক্যামেরাসহ অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্পষ্ট এটা মোসাদের কাজ। তারা বরাবর যেভাবে বিভিন্ন ফ্লাইটে বিভিন্ন দেশ থেকে অকুস্থলে এসে জড়ো হয় এবারও তাই করেছে। অতীতের মত তারা বিভিন্ন হোটেলে থাকতে শুরু করে এবং ইন্টারন্যাশনাল অপারেটরের মাধ্যমে ফোন ব্যবহার করে। তারা জেনুইন ব্যবসায়ীর বেশ ধরে কিম্বা পর্যটকের।



দাগান

পক্ষান্তরে আরও কিছু অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ কাজ পশ্চিমা গোয়েন্দাদের। পশ্চিমারা এভাবেই খতম করে। ফলে একথা নির্দ্বিধায় বলা

যাবে না কারা খুনী। এদিকে জার্মান সাপ্তাহিকী লিখেছে, জার্মান গোয়েন্দারা সংসদকে জানিয়েছে মোসাদই আল মাবুহের হত্যাকারী।

আল আরারিয়া সংবাদপত্রে এক সাক্ষাৎকারে দুবাই পুলিশ ঢালী তামিম জানান, মোসাদই হত্যাকারী। তিনি ডিএনএ টেস্ট, হাতের ছাপ, জাল পাসপোর্ট বহন এবং পরবর্তীতে উৎঘাটিত সকলেই ইসরাইলের বাসিন্দা বলে প্রমাণিত হওয়ায় বুঝতে বাকী থাকে না মোসাদই কিলার। অবশ্যই মোসাদ একশ ভাগ কিলার।

দুবাই পুলিশের প্রধান অবশেষে মিডিয়া স্টারে পরিণত হন। সারা বিশ্বের টিভি মিডিয়ায় তাকে একের পর এক সাক্ষাৎকার দিয়ে যেতে হয়েছে। দুবাই পুলিশ প্রধান তামিম সাংবাদিকদের যে ভিডিওটি দেখান তাতে মোসাদ সদস্যদের দুবাইজুড়ে কী ধরনের তৎপরতা ছিল তা ধরা পড়েছে।

দুবাই পুলিশ প্রধান তামিমের ভাষ্য অনুযায়ী হিট টিমের মূলে ছিল ১১জন। এর মধ্যে আইরিশ ৩জন, ব্রিটেনের ৬জন, এবং একজন করে ফরাসী ও জার্মান। ৬শত ৪৮ ঘন্টার সিকুরিটি ক্যামেরার টেপ দুবাই পুলিশকে সহায়তা করেছে।

এদিকে দুবাই এয়ারপোর্টের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ইমিগ্রেশন জানায়, আগমন নির্গমনের সব ছবিই তাদের কাছে রয়েছে। হত্যাকারী ১১জন নয়, আরও বেশ কয়েকজন মোসাদ সদস্য এতে অংশ নেয়। হয়ত ২৭জন হবে। তামিম পরে স্বীকার করেন যে, হত্যাকারীর সংখ্যা আরও কিছু বেশী হতে পারে।

তামিমের উপসংহারে প্রশ্ন জেগেছে মোসাদ কী জানত না দুবাই জুড়ে ক্যামেরা বসানো রয়েছে। তামিমের মতে এই অপরাশেন সফল করতে মোসাদ একাধিকবার দুবাই এসেছে। সেক্ষেত্রে কেন তাদের চোখে ক্যামেরা ধরা পড়ল না। তাছাড়া কাপড় বদলানো, উইগ পরা, গোফ কাটা ইত্যাদি তারা ক্যামেরাকে সাক্ষী রেখে করল কেন? আরেকটি প্রশ্ন হল, অপারেশনে খুব বেশি লোক লাগেনি।

তাহলে বেশি লোক আনার মূলে কী ধ্রূম্রজাল সৃষ্টি করা? কেননা তারা জানে এই টেপ পরবর্তীতে অবশ্যই দেখা হবে। আরেকটি প্রশ্ন হল, দুবাই

এয়ারপোর্টে সকলেরই ছবি তোলা হয়। মোসাদকী এখানকার এই সিস্টেমটা জানত না। আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা হল, ঘন্টার পর ঘন্টা ক্যামেরায় সব কিছু বন্দী হলেও দুটি ঘটনার কোন আলামত নেই। একটি হল আল মাবুহের রুমে প্রবেশের এবং তাকে হত্যা করে বের হয়ে আসার দৃশ্য।

পুলিশ প্রধান তামিম জানিয়েছেন, হিট টিমের সদস্যরা অস্ট্রিয়ায় একটি ফোনে কথা বলেছে। তামিমের ধারণা ঐ লোকের পরিচয় উদঘাটন সম্ভব এবং তিনি সম্ভবত মোসাদেরই লোক।

প্যারেনিয়ার নামের একটি মাস্টারকার্ড দিয়ে দুবাইয়ের আততায়ীরা লেনদেন কেনাকাটা করেছে। আইওয়া ভিত্তিক কোম্পানীতে রিচার্য করা যায় এমন কার্ড এটি। তবে একটি ফাক ঠিকই আছে। ঐ কোম্পানীর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ ইসরাইলে অবস্থিত।

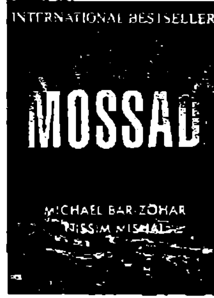
দুবাই পুলিশ আরেকটি মজার তথ্য দিয়েছে। সেটা হল হিট টিমের সদস্যদের অধিকাংশেরই ডুয়াল পাসপোর্ট রয়েছে। সামান্য কয়েকজন মাত্র জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করেছে।

আপাত দৃষ্টিতে আরব দেশগুলো ইসরাইলের শত্রুদেশ। যদি তারা ধরা পড়ত তখন দ্বৈত নাগরিকত্বের দোহাই দিয়ে বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়াকে তারা তাদের জন্য ফাইট করার আহ্বান জানাতে পারত। সর্বোপরি দুবাইয়ের উল্লেখিত দেশের কনসালরা কম্পিউটারে টিপ দিলেই এরা যে প্রকৃতপক্ষেই তাদের দেশের নাগরিক তা চিহ্নিত করতে পারতেন।

এদিকে যেসব দেশের জাল পাসপোর্ট মোসাদ ব্যবহার করেছে সে দেশগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া এবং আয়ারল্যান্ড তাদের মাটি থেকে মোসাদ প্রতিনিধিকে বহিষ্কার করে। পোল্যান্ড উরি নামের এক লোককে গ্রেফতার করে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেয়।

উরির বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুয়া তথ্যাদি দিয়ে দুবাই ঘটনার অন্যতম হোতা মিশেলকে সে জার্মান পাসপোর্ট পাইয়ে দিয়েছেন। উরি অবশ্য ৬০ হাজার ইউরো জরিমানা দিয়ে ছাড়া পায়। উল্লেখ্য গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে জাল পাসপোর্ট ব্যবহারের নিয়ম নেই।

দুবাই অভিযান মোসাদ কিম্বা ইসরাইলের জন্য একটা বিরাট সাফল্য হলেও মোসাদের নানা ভুল ভ্রান্তি নিয়েও কম সমালোচনা হয়নি। প্রথমত দুবাইকে ইসরাইল আন্ডারএষ্টিমেট করেছে। আবার পাসপোর্টসহ সকল ঘটনায় কয়েকটি দেশকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে। এতে ইসরাইলের আন্তর্জাতিক ইমেজ ক্ষুন্ন হয়েছে। দুবাই পুলিশ বলেছে, হিট টিমের সব সদস্যকেই ধরা হবে। কেননা তাদের পরিচিতি বিশ্ববাসী সবার জানা থাকলেও তাদের জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। দুবাই টিমের একজন মোসাদ সদস্যও গ্রেফতার হয়নি।



সাদ্দামের সুপারগান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯১৮ সালের ২৩ মার্চ প্যারিসের প্রেস ডিলা লিপাবলিকে বেশ কিছু কামানের গোলা এসে পড়ছিল। এর এক ঘন্টা পর প্যারিসে আরেকটা সেল বিস্ফোরিত হলে ৮জন লোক মারা যায়। বিস্ফোরণে প্যারিসের লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফ্রন্ট লাইনে অর্থাৎ যে অঞ্চলে যুদ্ধ হচ্ছিল সেখান থেকে প্যারিসের দূরত্ব অনেক। সেক্ষেত্রে প্যারিস ছিল শংকামুক্ত। প্যারিস জেলার কমান্ডার রাজধানী সন্নিহিত বনাঞ্চলে সেনা প্রেরণ করলেন। তার আশংকা ছিল সেখানে হয়ত জার্মান বাহিনী আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু কোন কিছুই পাওয়া গেল না। ফরাসীরা অনুমান করল, হয়ত কোন এয়ারসিপ থেকে ঐ গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। যদিও কোন জেপলীন কোথাও দেখা যায়নি। এর ছয়দিন পর গুড ফ্রাইডের দিন প্যারিসে আরেকটি কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। একটা চার্চে সেই গোলা সরাসরি এসে লাগে। এতে ৯১জন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হয়।

প্যারিস জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সারা শহরে সেনা টহল বাড়ানো হয়। কিন্তু কোথাও সন্দেহজনকও কিছু পাওয়া যায় না। এতদূর থেকে কামান ছুঁড়ে প্যারিসে আঘাত হানা সম্ভব এমনটি ইতিপূর্বে কেউ শোনেনি, কল্পনাকেও যেন হার মানায়। পত্রিকাগুলো জনপ্রিয় লেখক জুলভার্নের ফ্রম দ্যা আর্থ টু দ্য মুন বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদন লিখতে শুরু করে।

ফ্রান্সবাসীর ভাগ্য ভালো। বছর না ঘুরতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। জার্মানরা পরাজিত হয়। যাইহোক যুদ্ধ শেষে প্যারিস জুড়ে আবার কামানের গুঞ্জন শুরু হয়। অনেকেই আতঙ্কিত সেই কামানের নাম দেয় 'প্যারিস গান'। উইলহেমট্‌ ছিলেন জার্মানির সম্রাট ক্রাপ। হেভী উইপেলস ফ্যাক্টরীতে নাকি একটি রহস্যজনক কামান তৈরী শুরু করা হয়েছিল। ঐ কামান নাকি ১২৮ কিলোমিটর দূরে গিয়ে আঘাত হানতে সক্ষম ছিল। গোলাগুলো ছিল ৩ফুট লম্বা। অবশ্য ঐ কামানের সুনাম ক্ষুণ্ন করে অর্থাৎ রেকর্ড ভাংগে জার্মানি ভিটু রকেট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ রকেট দেখা যায়। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে ক্রাপ কোম্পানী তিনটি সুপারগান তৈরি করেছিল। বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্যত্র এই সুপারগানগুলো স্থানান্তরিত করা হত। প্রতিটি সুপারগানের সঙ্গে থাকত ৮০জন পদাতিক সেনা। এ ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ করা তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ।

যুদ্ধ শেষে এই সুপারগানের পরিণতি নিয়ে নানা কল্পকাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। তবে সত্যতা হল একটি সুপারগান নিষ্ক্রিয় করার সময় সংঘটিত বিস্ফোরণে ৫জন সেনা নিহত হয়। বাকী দুটোর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি যুদ্ধ শেষে। কোথায় হারিয়ে গেল এ নিয়ে রয়েছে নানা রহস্য। হয় তাদের কোন গুহায় লুকিয়ে ফেলা হয়েছে অথবা অংশ অংশ খুলে ফেলা হয়েছে।

সুপারগানগুলো লিজেন্ডে পরিণত হয়ে গেল। অনেকেই ভাবল সুপারগানের রহস্য কোনকালেই জানা যাবে না। কিন্তু ১৯৬৫ সালে এক বয়স্কা জার্মান মহিলা কানাডায় এলেন। তার উদ্দেশ্য ৩৭বছর বয়স্ক এক বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ লাভ ড. জেরাল্ড বুল মন্ট্রিয়েলের মকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ভদ্রমহিলা রাউসেন বার্জারের আত্নীয়া। রাউসেন বার্জার ইন্ডাস্ট্রিজের নকশা বিভাগের প্রধান ছিলেন।

আগত মহিলা ড. বুলের একটি হারানো পাণ্ডুলিপি তাদের পারিবারিক আর্কাইভে খুঁজে পান। ঐ পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে বিগ গান সম্পর্কিত বিস্তারিত এবং সেই বিগগান কী করে অপারেট করতে হয় তাও।

ড. বুল ছিলেন এককথায় এক জিনিয়াস। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি পিএইচডি করেন। কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর কেউ অত কম বয়সে

পিএইচডি করেননি। ড. বুল স্বপ্ন দেখেছিলেন সুপার গানের। তিনি এমন গান তৈরি করতে চেয়েছিলেন যার সাহায্যে বহু বহু দূর থেকে গোলা নিক্ষেপ করা যায়। পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ড. বুল একটা বইও লিখেছিলেন। বই লেখার উদ্দেশ্য আগামী দিনের বিজ্ঞানীরা যাতে এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সুপারগান তৈরি করতে পারে।

ড. বুলের বইটি যথেষ্ট না হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকার এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বুল শিক্ষকতা করতেন তারা ড. বুলকে সুপারগানের ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বার্বাডোসে ড. বুল তার নির্মিত একটি বিশাল গানের পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। এর আগে এত বড় হিউজ গান আর বিশ্বে দ্বিতীয়টি তৈরি হয়নি। এই সুপারগানের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৩ মিটার লম্বা। ক্যালিবার ছিল ৪২৪ মিলিমিটার। স্থানীয় শতশত শ্রমিক প্রকৌশলী এই সুপারগান তৈরি এবং এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের সাথে যুক্ত ছিলেন। ড. বুল সাফল্য শেষে আরও দাবি করেন যে, শেলের পরিবর্তে যদি তিনি সলিড ফুয়েলের মিশাইল প্রপেল করতেন, তাহলে তিনি ২০০ পাউন্ড মিসাইল চার হাজার কিলোমিটার দূরত্বে ছুঁড়তে সক্ষম। আর যদি উর্দ্ধকাশে ছোটে তা ২৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাবে।



সাদ্দামের সুপারগান

ড. বুলের সুপারগান এককথায় একটা বিশাল অর্জন। কিন্তু আমেরিকা ও কানাডা সরকার নানা হিসেব-নিকেশ করে তার প্রকল্পে অর্থায়ন করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৬৮ সালে ড. বুলকে বার্বাডোস ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ফলে তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। অতঃপর প্রচন্ড ঘৃণার সাথে আমলাদের আক্রমণ করেন তার প্রকল্প বানচালের জন্য।

ড. বুল কিছুদিন পর আর্টিলারি শেল নির্মাণ শুরু করেন এবং আমেরিকায় তৈরি বন্দুকের মাধ্যমে ইসরাইলে ৫০হাজার সেল বিক্রি করেন। এমনকী তাকে আমেরিকায় অনারারি নাগরিকত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তার মুখ ভালো ছিল না। তিনি যত সিনিয়র লোকের সাথে কাজ করেছেন তাদের সাথে বিরোধ বাড়িয়েছেন। আর বার্বাডোসে তার প্রকল্প বন্ধ করার জ্বালা ও ক্ষোভ তো এর মধ্যে ছিলই। তবে যে কোন মূল্যে সুপারগান তৈরির জন্য তিনি ছিলেন সংকল্পবদ্ধ। এটি তার সংকল্প হয়ে দাড়ায় এবং কোন কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না– এটাই ছিল তার বিশ্বাস।

প্রথমে তিনি তৈরি করেন জিসিফোরটি ফাইভ গান। ঐ সময় এত অত্যাধুনিক গান আর ছিল না। এর রেঞ্জ ছিল ৪০ কিলোমিটার। বুল যাকে-তাকে এই বন্দুক বিক্রি করতে শুরু করলেন। জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও ড. বুল তা অগ্রাহ্য করে সে দেশে অস্ত্র পাঠিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অস্ত্র তৈরির লাইসেন্সও বিক্রি করেছিলেন বুল-যাতে তারা অস্ত্র বানাতে পারে।

অনেকের মতে সিআইএ গোপনে ড. বুলের অবৈধ কার্যক্রম সমর্থন করত। কিন্তু বিষয়টি যখন প্রকাশ্য হয়ে পড়ে তখন বুলের সিআইএ বন্ধু লাপাত্তা হয়ে যায়। একা হয়ে যান ড. বুল। ওদিকে জাতিসংঘ তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। অস্ত্র তৈরি ও গোপনে বিক্রির অভিযোগ আনে জাতিসংঘ তার বিরুদ্ধে। তাকে আমেরিকায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল একটি দুঃসংবাদ।

আমেরিকার একটি আদালক অবৈধ ব্যবসার অভিযোগে তাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়। জেল খেটে কানাডায় ফিরে এলে তাকে ৫০ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়। ক্রুদ্ধ হতাশ ড. বুল বেলজিয়ামে গিয়ে সেখানে একটি

নতুন কোম্পানী খোলেন। এখানে তার সহযোগী ছিল ইউনাইটেড গান পাউডার ওয়ার্কস।

সুপারগান বানানোর স্বপ্ন ড. বুলের মধ্যে সবসময়ই জাগরুক ছিল। জুলভার্ন যে ধরনের সুপার গানের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার চেয়েও বড়। গেট্যে তার উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে শয়তানের কাছে তার আত্মা বিক্রিতেও প্রস্তুত ছিলেন। হ্যাঁ, ডা. বুলও এরকম একটি শয়তানের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। ইরাকের স্বৈরশাসক। আর তিনি হলে সাদ্দাম হোসেন।

আশির দশকে ইরাক ইরানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। বুল সাদ্দামের কাছে দুইশত জিসিফোরটি ফাইভগান বিক্রি করেন। এগুলো তৈরি হয় অষ্ট্রিয়ায়। এগুলো জর্ডানের আকাবা বন্দর থেকে চোরাচালান হয়ে ইরাকে আসে। এটা ছিল সাদ্দাম ও ড. বুলের যৌথ প্রকল্পের শুরু।

ড. বুলের মত সাদ্দাম হোসেনও ছিলেন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। বিশেষ করে ইসরাইল যখন তামুজ পরমাণু চুল্লী বোমা মেরে ধ্বংস করে তখন সাদ্দাম হোসেন খুবই ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। তামুজ কেন্দ্রের মাধ্যমেই সাদ্দাম পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সাদ্দাম ইসরাইলের প্রতি ঈর্ষাও অনুভব করতেন। কেননা ইসরাইল মহাকাশে স্যাটেলাইট প্রেরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

ড. বুল সাদ্দামের কাছে অফার করলেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সবচে দূর পাল্লার সুপারগান তাকে বানিয়ে দেবেন। বুল সাদ্দামকে প্রতিশ্রুতি দিলেন ইরাক মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাবেই এবং যে ফায়ারশেল বানিয়ে দেবে তা হাজার মাইলের বেশী অতিক্রম করতে পারবে। সাদ্দাম হোসেন উপলব্ধি করলেন ইসরাইলের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বোমা ফেলার সুযোগ তার হাতের মুঠোয়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ড. বুলের অফার গ্রহণ করলেন। ড. বুল তার প্রকল্পের নাম দিলেন প্রজেক্ট ব্যবিলন।

ড. বুল সাদ্দাম হোসেনের ব্যবিলন প্রজেক্টের জন্য একটি সুপারগানের পরিকল্পনা করলেন। এর দৈর্ঘ্য হবে ১৫০ মিটার ওজন ২১০০ টন। ক্যালিবার ১ মিটার। দৈত্যাকার গান বানানোর আগে ড. বুল এর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি হবে পরীক্ষামূলক। তিনি এর নাম দিলেন বেবী

বেবিলন। এই বেবী বেবিলন অতীতের সব গানের চেয়ে বড়। এই গানটির দৈর্ঘ্য ছিল ৪৫ মিটার। সাদ্দামের আর্টিলারী কমান্ডার এর কার্যক্ষমতার ব্যাপারেও সশ্রদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আসল গানটির সাথে কোন তুলনাই চলে না। এক কথায় এটা মহাবিস্ময়ে পরিণত হবে। আর ইরাকের মরুভূমিতে জন্ম হবে এর।

ড. বুল তার জায়ান্ট গান বানানোর জন্য ইরাকের একটি দুর্গম পাহাড়ী এলাকা বেছে নিলেন। লোকেশন চূড়ান্ত করে ড. বুল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য আদেশ দিলেন। এই বৃহৎ কামানের মূল তো অবশ্যই ব্যারেল। এই ব্যারেলে বুল প্রচুর পরিমাণ স্টীল টিউব ব্যবহারের পলিকল্পনা করেন। তিনি ইংল্যান্ড, স্পেন, হল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডে অর্ডার দিলেন টিউবের জন্য। ঐ সব দেশের সাথে তিনি ছলচাতুরীর আশ্রয় নেন।

সুপারগানের বিষয়টি চেপে গিয়ে তিনি বলেন যে, একটি বড় মাপের তেলের পাইপ লাইনের জন্য এসব স্টীল প্রয়োজন। এই চাতুরীর কারণ কৌশলগত অস্ত্র বানানোর ব্যাপারে ইরাকের ওপর আন্তর্জাতিক কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আর এসব উপকরণ প্রতিবেশী জর্ডানের নামে আমদানি করা হচ্ছিল।

পাইপ যথারীতি ইরাকে আশা শুরু হল। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, অধিকাংশ দেশ এবং রপ্তানিকারক কোম্পানীই বুঝতে পেরেছিল যে, এসব পাইপ তেল উত্তোলনের কাজে নয় বরং মারাত্মক কোন অস্ত্র বানানোর কাজের জন্য নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাদের লোভের কারণে তারা প্রায় চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে ঐ সব দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন এবং যেখানে আরও বিরোধ ফেনিয়ে ওঠুক এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐক্যমত্য ছিল। এইসব পাইপের ক্ষেত্রে রপ্তানী লাইসেন্স দেয়া হয় এবং মালবাহী জাহাজে করে ইরাকে পাঠানো শুরু করে। অধিকাংশ পাইপই ইরাকে নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছে।

ড. বুলের টেকনিশিয়ানদের প্রাইভেট আর্মি এবং প্রকৌশলীরা সুপারগানের অংশগুলো জোড়া লাগাতে শুরু করল। এই গানের মুখ নিবদ্ধ করা হল পশ্চিম ও ইসরাইলের দিকে। কিন্তু ড. বুল এখনো সন্তুষ্ট নন। তিনি ইরাকের জন্য সেলফ প্রোপেলড দুটি গান বানালেন। একটির নাম আল মজনুন এবং আল কাও। আল মজনুনকে অবিলম্বে ইরাকে পদাতিক বাহিনীতে যুক্ত করা হল।

ড. বুল একই সাথে ইরাকের স্কাড মিসাইলের উন্নয়নে কাজ শুরু করলেন। তিনি স্কাডের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করলেন। সেগুলো আরও আধুনিক হয়ে উঠল। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কথা।

ড. বুল একে একে সীমা অতিক্রম করতে শুরু করলেন। ড. বুলের ছেলের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ইসরাইলের গোয়েন্দারা তার বাবাকে এই ধ্বংসের খেলা থেকে সরে আসার জন্য সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু এসব কানে নিতে অস্বীকৃতি জানান। শুধু ইসরাইল এই বিজ্ঞানীকে থামাতে আগ্রহী ছিল তা নয়। সিআইএ, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী এমসিক্সটিনও এই বিজ্ঞানীকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিল।

একই কথা প্রযোজ্য ইরানীদের ক্ষেত্রেও। ইরাক ইরান যুদ্ধের সময় ইরাকীরা ড. বুল নির্মিত অস্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। ফলে বিশ্বের বহু দেশ এই বিজ্ঞানীকে স্তব্ধ করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

ড. বুল যখন বিদেশিদের সতর্কবার্তার কোন পাত্তাই দিচ্ছিলেন না, তখন তা প্রতিরোধে তারাও নানাপন্থা গ্রহণের কথা ভাবলেন। যেমন ১৯৯০ সালের শীতকালে ব্রাসেলসে বুলের বাড়ি বেশ কয়েকবার ভাংচুর করা হয়। হামলাকারীরা বাড়ি থেকে কোন মালামালই নেয়নি। শুধুমাত্র ফার্নিচার ভাংচুর ও ওলটপালট করেছে। ফলে এই হামলার উদ্দেশ্যে ড. বুলের সম্যক না বোঝার কারণ ছিল না। কেননা এটা ছিল একটা হুমকি, সাবধান হয়ে যাও। তোমাকে আমরা যখন যা খুশি করতে পারি।

আবারও ড. বুল এই হুমকি আমলে নিলেন না। গানের অংশ ঠিকই ইরাকে আসতে লাগল। এবং প্রতিপক্ষের আর বুঝতে বাকী রইল না, ড. বুলকে এই প্রকল্প থেকে সরানো যাবে না।

১৯৯০ সালের ২২ মার্চ। বুল তার ব্রাসেলসের বাসায় ফিরছিলেন। ফ্ল্যাটের চাবি যখন পকেটে হাত ঠুকিয়ে তিনি খুঁছিলেন তখন অন্ধকার থেকে একজন লোক এগিয়ে আসল। এক নিঃশব্দ বন্দুক তার হাতে। লোকটি ড. বুলের মাথার পেছনের দিকে পরপর পাঁচটি গুলি করলেন। বিশালাকার কামানের স্বপ্নপুরুষ ড. বুল কাত হয়ে পড়লেন এবং ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হল।

বিশ্ব গণমাধ্যম আততায়ীর পরিচয় নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করতে লাগল। কেউ বলল সিআইএ এই ঘটনার জন্য দায়ী। কেউ বলল এমসিক্সটিন। এ্যাংগোলা ও ইরানের প্রতিও ইংগিত করল কেউ কেউ। কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষকেরই সন্দেহের তীর ছিল ইসরাইলের দিকে। বেলজিয়াম সরকার তদন্ত শুরু করল বটে কিন্তু কোন সূত্রই পেলো না। আজও ড. জেরাল্ড বুল হত্যাকাণ্ডে কাউকে ধরা হয়নি।

ড. জোরাল্ড বুলের মৃত্যুতে সাদ্দাম হোসেনের সুপারগানের কাজ অবিলম্বে বন্ধ হয়ে গেল। ড. বুলের সহকারী, প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, গবেষক দল, ক্রেতা, সকলেই বিশ্ববাসী ছড়িয়ে পড়ল। এই কর্মীবাহিনী সুপারগানের যন্ত্রাংশগুলোর সাথে সম্যক পরিচিত বটে কিন্তু সুপারগানের মাস্টারপ্ল্যান তালাবদ্ধ ছিল ড. বুলের মস্তিষ্কে। এবং তিনিই একমাত্র ছিলেন পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়াটির। ড. বুলের মধ্য দিয়ে বেবীলন প্রকল্পের মৃত্যু ঘটল।

ড. বুলের মৃত্যুর দু'সপ্তাহ পরে দীর্ঘ নীরবতা ভংগ করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নড়ে উঠল। তারা একটি কাষ্টমস ইউনিটকে বন্দরে পাঠিয়ে আটটি বিশালাকায় শেফিল্ড কোম্পনীর পাইপ আটক করল। চালানে লেখা ছিল ওয়েল পাইপ। ব্রিটিশদের এই কর্মকাণ্ড প্রশংসা কিন্তু দেরি করে ফেলেছিল তারা।

ব্রিটিশ সরকার ৪৪টি পাইপ আটকে ব্যর্থ হয়। কেননা বন্দর থেকে এগুলো তেলের পাইপ হিসেবে রপ্তানি হয়ে গিয়েছিল এবং ইরাকে ইতিমধ্যে তা কাজে লাগানো হয়েছিল। ঐ সময়েই জায়ান্ট গানে ব্যবহার্য বেশ কিছু যন্ত্রাংশ ইউরোপের ৫টি দেশে আটক করা হয়। ইংল্যান্ডের কর্মকর্তারা এ লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয় দায়িত্বশীল কোম্পানীগুলো বিশেষ করে শেকিল্ড সাদ্দাম হোসেনের বিগগানের জন্য অর্ডারগুলোর বিপরীতে মালামাল সরবরাহ না করলেও পারত। কেননা এর মাধ্যমেই সাদ্দাস হোসেন মানব বিধ্বংসী সুপারগান তৈরি করতে যাচ্ছিলেন।

২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাক দখল করে তখন তারা প্রচুর পরিমাণ ষ্টীল পাইপ স্তূপকৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

ড. জেরাল্ড বুলের হত্যাকাণ্ড এমন সময় ঘটল যখন মোসাদ গভীর একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৪৯ সালে মোসাদের প্রধান হয়ে এসেছিলেন সংগঠনের ভ্যাটার্ন এজেন্ট শাবতাই শাবিত। কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষ করলেন কিভাবে মোসাদের কর্মকাণ্ড দিনে দিনে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে যুক্তদের ক্ষেত্রে কিম্বা এবং আশি ও নব্বুই দশকে মোসাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলে বিস্তর ফারাক ধরা পড়বে। আগে যেখানে মোসাদ বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে রহস্যের কিনারা করত সেখানে মোসাদ স্পেশাল অপারেশনের পথ বেছে নিতে শুরু করল। ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্য যারা হুমকি হয়ে উঠেছিল মোসাদ তাদের বিরুদ্ধে বেসামরিক ও অস্ত্রচালিত পন্থায় প্রতিশোধ গ্রহণের দিকে এগুতে থাকল।

অতীতের ইসরাইলি রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলো কার্যকরভাবে সন্ত্রাস দমনে সফলতার মুখ তেমন দেখতে পায়নি। সন্ত্রাসবাদী নেতারা বিদেশে নিরাপদে বাস করতেন এবং আক্রমণের পরিকল্পনা জানাতেন। কিন্তু কাজটা তিনি নিজে করতেন না। সারা বিশ্বব্যাপী তাদের যে লোক বা সমর্থক ছিল তারা অপারেশন পরিকল্পনা করতেন। ইসরাইল ভালো করেই জানত কোন নেতা অন্তর্ঘাতের সাথে যুক্ত। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করা কিম্বা বিচারের সম্মুখীন করা কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র পথ ছিল মোসাদকে বলা তাদের খুঁজে বের কর এবং হত্যার নির্দেশ দেয়া ছাড়া। কাজটা নিষ্ঠুর।

ডেভিড মোলাড এ ধরনের বহু অভিযান পরিচালনা করেছেন বটে। কিন্তু সর্বাত্মক সাফল্য আসে তখনই যখন নেতাকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে তার সংগঠনটি নিশ্চল বা অকেজো হয়ে পড়ে অন্তত কয়েক বছরের জন্য। ব্লাক সেপ্টেম্বর নেতাদের নিধনের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি খুব সফল হয়েছিল। ড. জেরাল্ড বুলকে হত্যার মাধ্যমেও অনুরূপ ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। ড. বুলের হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি সরকারি ভাবে কখনোই উদঘাটিত হয়নি। তার মৃত্যু মানেই একটি ভিন্ন চিন্তার পরিসমাপ্তি। ড. বুলের অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ওয়াদি হাদ্দাদের ক্ষেত্রেও।

ড. ওয়াদি হাদ্দাদকে হত্যার ঘটনাটি শুরু হয়েছিল এক বাক্স চকলেট দিয়ে। ড. ওয়াদি হাদ্দাদ ছিলেন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্যা লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের প্রধান। ইসরাইলের শত্রুদের মধ্যে তিনি শীর্ষ বটে। তার সর্বোচ্চ দুর্ধর্ষ

অভিযানের একটি হল ১৯৭৬ সালের ২৭ জুন এয়ার ফ্রান্সের একটি প্লেন ছিনতাই করা। প্লেনটি তেলআবিব থেকে ফ্রান্সে যাচ্ছিল। আরব, জার্মান ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু সন্ত্রাসী ঐ প্লেনের পাইলটকে বাধ্য করে সেটিকে উগান্ডার রাজধানী এনতেব্বেতে নামাতে। তাদের দাবি ছিল ইসরাইলী ও ইহুদী জিম্মিদের তাদের জিম্মায় দিতে হবে। ইসরাইলি কমান্ডোরা হাজার মাইল উড়ে গিয়ে এই দুঃসাহসিক অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করে। তারা পৌছে যায় এনতেব্বেতে। কমান্ডোরা বিশ্বের ভয়ংকর এই সন্ত্রাসী গ্রুপকে হত্যা করে জিম্মিদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

এনতেব্বের ঘটনার পর হাদ্দাদ উপলব্ধি করেন যে, তার জীবন এখন বিপন্ন এবং তার সদর দফতর বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন। কেননা বাগদাদে তিনি নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিলেন। ইরাক থেকেই তিনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন।



সাদ্দাম ও ড. বুল

ইসরাইলের এই জাত শত্রুকে খতম করতে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? খোঁজ শুরু হল ড. হাদ্দাদের যাবতীয় দুর্বলতার। এভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে মোসাদ জানতে পারে চকলেটের প্রতি হাদ্দাদের অপরিসীম দুর্বলতা। বিশেষ করে বেলজিয়ামের

সেরা চকলেট। আবার এই খবরটি দেয় ফিলিস্তিনের একটি বিশ্বস্ত সূত্র যাকে মোসাদ হাদ্দাদের পপুলার ফ্রন্টে ঢুকিয়েছিল।

মোসাদ প্রধান চকলেট প্রীতির কথা ইসরাইলের নয়া প্রধানমন্ত্রী বেগিনের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি অবিলম্বে চকলেটের মাধ্যমে এই অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। মোসাদ এজেন্টরা হাদ্দাদের বিশ্বস্ত এক অনুচরকে এ কাজে নিয়োগ দেয়। হাদ্দাদের বিশ্বস্ত ঐ সহকর্মী তখন ইউরোপে একটি মিশনে ছিলেন। তিনি তার বস হাদ্দাদের জন্য বিশাল সাইজের গোভিতা নামের চকলেটের একটি বাক্স নিয়ে আসেন। মোসাদ বিশেষজ্ঞরা ঐ চকলেটে প্রাণঘাতী বায়োলজিকাল বিষ ইনজেশন দিয়ে ঢুকায়। মোসাদ এজেন্টরা আশা করে যে, হাদ্দাদ তার এই প্রিয় চকলেট একাই খাবে। কাউকে ভাগ দেবে না।

এজেন্ট বিষমাখা চকলেটের ঐ বাক্স হাদ্দাদকে দেন। তিনি একাই সবগুলো চকলেট খান। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাদ্দাদের খাওয়ার রুচি চলে যায় এবং ওজন কমতে শুরু করে। রক্ত পরীক্ষা করে তার ডাক্তাররা জানান যে, হাদ্দাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষিত প্রায়। বাগদাদের কেউ ধারণা করতে পারছিলেন না যে, পপুলার ফ্রন্টের নেতার স্বাস্থ্যের কেন এত অবনতি ঘটছে কোন কারণ ছাড়াই।

হাদ্দাদের স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়ছে। তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। অস্থি চর্ম বেড়িয়ে আসার উপক্রম। একটি বিছানাই তার একমাত্র শয্যা হয়ে উঠল। তাকে জরুরীভিত্তিতে পূর্ব জার্মানীর একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হল। সোভিয়েট ব্লকের অন্যান্য দেশের মত পূর্ব জার্মানী ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ করে আসছিল। কিন্তু ড. হাদ্দাদের ক্ষেত্রে তাদের কোন সহযোগিতা কাজে আসল না। তারা হাদ্দাদকে বাঁচাতে পারল না।

১৯৭৮ সালের ৩০ মার্চ ড. হাদ্দাদ ইন্তেকাল করেন। ডাক্তাররা বলেন, অজ্ঞাত রোগ। ৪৩ বছর বয়সী এই সন্ত্রাসী নেতার মৃত্যুর পর তার বোনের কাছে লক্ষ লক্ষ ডলার রেখে যান। ফিলিস্তিনিদের জন্য তার পবিত্র যুদ্ধের জন্য বহু লোক বা প্রতিষ্ঠান তাকে টাকা দিত বলে ধারণা।

পূর্ব জার্মান ডাক্তারা বলেন যে, ড. হাদ্দাদ এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন যে, তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেউ অবশ্য এ ঘটনায়

মোসাদকে দায়ী করল না। হাদ্দাদের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ইরাককে বিষ প্রয়োগের জন্য দায়ী করল। কেননা ড. হাদ্দাদ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর ইসরাইলি লেখকদের ড. হাদ্দাদ সম্পর্কিত সত্য প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। এই লেখকরা মনে করতেন ড. হাদ্দাদের অপরিণত বয়সে মৃত্যুর মূলে মোসাদের হাত রয়েছে। এর ত্রিশ বছর পর যখন ইয়াসির আরাফাত মারা যান তখন তার ঘনিষ্ঠজনরা এই মৃত্যুর জন্য ইসরাইলকে দায়ী করেছেন। ঐ অভিযোগ কখনোই প্রমাণিত হয়নি। ইয়াসির আরাফাতকে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা ও টেষ্ট করেছিলেন তারই ফ্রান্সের ডাক্তার।

ড. হাদ্দাদের মৃত্যুর পর তার নেতৃত্বাধীন ভয়ংকর সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে। হাদ্দাদের লোকজনের ইসরাইল বিরোধি কর্মকাণ্ড চূড়ান্তভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং ইসরাইলের ঘোরতর ঘৃণিত শত্রু প্রকৃতপক্ষেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ড. বুল ও ড. হাদ্দাদের পর সাকাকীর পালা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অটোমান সুলতান রাজকীয় নেভীর একজন বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় কমান্ডারকে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ মাল্টা অভিযানে পাঠিয়ে ছিলেন। এডমিরাল পাল তুলে অভিযানে বের হয় এবং কয়েকমাস সমুদ্রে মাল্টা দ্বীপের সন্ধান করতে থাকেন। এক সময় তিনি ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। সুলতানের কাছে দেয়া এক রিপোর্টে তিনি জানান, মাল্টা বলে কোন দ্বীপের অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু আমাদের সময় কেউ কেউ ঠিকই মাল্টার সন্ধান পেতে পারেন। শুধু মাল্টা দ্বীপের সন্ধানই মেলেনি সেখানে আগত এক ছদ্মবেশীকেও খুঁজে পেয়েছেন। তিনি খুবই গোপনে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। এই ব্যক্তি হলেন ড. সাকাকী। তিনি ইসলামী জেহাদের প্রধান।

১৯৯৫ সালের ২৬ অক্টোবর সকালে ফাতহি সাকাকী মাল্টার সেলমা শহরের ডিপ্লোম্যাট হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। দামেস্কে ফিরে যাওয়ার আগে কিছু কেনাকাটার জন্য তিনি বেরিয়েছিলেন। তাই হোটেলে তিনি বেশ কয়েকদিন ছিলেন। সাকাকীর মাথায় ছিল পরচুলা। হাতে লিবিয়ার পাসপোর্ট। পাসপোর্টে তার নাম ইব্রাহীম সায়ুশ। এই শহরে তিনি নিজেকে নিরাপদ ভাবতেন। তিনি জানতেন তার এখানে আসার পর থেকেই মোসাদের কিছু

লোক তাকে ফলো করে চলেছে। আন্ডার গ্রাউন্ড ফিলিস্তিনি সংস্থাসমূহের এক সম্মেলনে তিনি মাল্টা থেকে লিবিয়া যাবেন।

এই ঘটনার ৯ মাস আগে ২২ জানুয়ারী দুই আত্মঘাতী যারা শাকাকীর ইসলামিক জিহাদের সদস্য নিজেদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন। নেতান্না বাস স্টেশনের কাছে বেইট লিভ জংশনের অদূরে তারা আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ছিলেন। এই ঘটনায় ২১ জন নিহত হন। এদের মধ্যে অধিকাংশই সৈন্য। আহতের সংখ্যা ৬৮। ইসরাইলের ইতিহাসে এটি একটি বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন ঘঠনার পরপরই বেইট লীডে যান এবং বোমাবাজির ঘটনায় খুবই কষ্ট পান। তিনি এই ঘটনার কয়েকদিন পর টাইম ম্যাগাজিন পড়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কেননা সেই পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে সাকাকী উল্লেখ করেন যে, ফিলিস্তিনে আরব ইসরাইল যুদ্ধের ঘটনাগুলো ছাড়া এটাই সর্বোচ্চ বড় সামরিক আক্রমণ।

টাইম ম্যাগাজিন সাকীতে প্রশ্ন করে যে, এই ঘটনায় মনে হচ্ছে আপনার মনে শান্তি হচ্ছে। আপনি এই প্রাণহানিতে সন্তুষ্ট। সাকাকী বলেন, এটা আমাদের মানুষদের মনে শান্তি ও সন্তুষ্টি এনে দিয়েছে। ক্রোধান্বিত প্রধানমন্ত্রী রবীন মোসাদ প্রধান সরতাই শাভিতকে নির্দেশ দেন ইসলামিক জিহাদ প্রধানকে হত্যার। শাভিত দীর্ঘদিন ধরে খুঁজতে থাকেন সাকাকীকে।



সাবেক মোসাদ প্রধান সাবতাই সাভিত

একটি পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী মোসাদ দামেস্কে সাকাকীর সদর দফতরে হামলা চালানোর অনুমতি চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যর্থ হয়। কেননা রবীন চান না সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের সঙ্গে গোপনে শান্তির অন্বেষায় যে আলোচনা চালাচ্ছিলেন এক্ষনে ঐ শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাক। কেননা ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশীর সাথে ঐ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী রবীন সাকাকীকে ধরতে বা হত্যায় বিকল্প রাস্তা খুঁজে বের করতে নির্দেশ দেন। মোসাদ প্রধান বলেন যে, সাকাকী ভালো করেই জানেন যে, তিনি তাদের হিটলিস্টে রয়েছেন। ফলে সিরিয়ার বাইরে তিনি খুব একটা যান না। তারপর রবিন বললেন দামেস্কে কোনভাবেই সাকাকীকে হিট করা যাবে না। করতে হয় সিরীয় সীমান্তের বাইরে গিয়ে কর।

এখন প্রশ্ন, কোথায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে। মাথা খারাপের যোগাড় মোসাদের শীর্ষ কর্মকর্তাদের। এরই মধ্যে সিরিয়ার বাইরে একটা সুযোগ এসে গেল। লিবিয়া থেকে দাওয়াত পেলেন সাকাকী। ফিলিস্তিনি বিভিন্ন সংগঠন সেখানে সম্মেলন করবে।

প্রথমে সাকাকী ঐ সম্মেলনে যেতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন, তার জাতশত্রু আবু মুসা সংগঠনের আবু মুসা সেখানে যাচ্ছেন তখন তিনিও তাতে শরীক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মোসাদ বিশেষজ্ঞর ধারণা করলেন সাকাকী তার চিরশত্রু মুসাকে এককভাবে ফ্লোর ছেড়ে দেবেন না। সাকাকী লিবিয়া যাচ্ছে বলে সিদ্ধান্ত হল। একটি গোপন সূত্র দামেস্ক থেকে জানাল, লিবিয়ায় যাচ্ছেন সাকাকী। জেরুজালেমে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী অতঃপর তার লোকদের নির্দেশ দিলেন, সেখানেই তাকে হত্যার।

ইউরোপীয় সূত্রগুলোর দাবি, মোসাদের লোকজন অতঃপর সাকাকী কোন পথে লিবিয়া যেতে পারেন তা নিয়ে গবেষণায় বসল। অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেল সাকাকী বরাবরই লিবিয়া গেছেন মাল্টা হয়ে। মোসাদ প্রধান মাল্টাতেই সাকাকীকে খতমের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা লিবিয়ার চেয়ে মাল্টায় এ ধরনের অভিযান পরিচালনা সহজ। লিবিয়ার চেয়ে মাল্টা অনেক বেশী নিরিবিলি শহর।

মোসাদ এজেন্ট সাকাকীর অপেক্ষায় ভ্যলেট্টা বিমান বন্দরে অবস্থান নেন। কেননা তিনি মাল্টায় কিছুটা সময় কাটাবেন বলে তাদের ধারণা। সাকাকী তার পিছু নেয়াদের বোকা বানিয়ে দামেস্ক থেকে সর্বশেষ ফ্লাইটে মাল্টা এসে পৌছান। ব্যাপক ছদ্মবেশ ধারণ করে সাকাকী ট্রানজিট লাউঞ্জে কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং কানেকটিং ফ্লাইটে লিবিয়া যান।

২৬ অক্টোবর খুব সকালে সাকাকী আবার মাল্টায় ফিরে আসেন এবং বরাবরের মত ডিপ্লোম্যাট হোটেলে ওঠেন। এবার তার কক্ষ নং ৩১৬। হোটেলে উঠেই তিনি বাইরে বেরিয়ে যান। তিনি যেখানে যেখানে যান মোসাদের দু'জন লোক একটি নীল রঙের মোটর সাইকেলে তাকে অনুসরণ করেন। তিনি কয়েক ঘন্টা দোকানে দোকানে কাটান। কেনাকাটা শেষে যখন তিনি হোটেলে ফিরছিলেন তখন নীল রংয়ের ঐ মোটর সাইকেল তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে থামায়।

পরবর্তীতে মোসাদের এক এজেন্ট জানান, সাকাকী এগিয়ে এলে খুব কাছ থেকে তার উপর ৬টি গুলি ছোঁড়া হয় শব্দহীন বন্দুক দিয়ে। সাকাকী সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। হত্যাকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অবশ্য হত্যাকারী ছিল একজনই, অন্যজন মোটর সাইকেল চালু রেখে অপেক্ষা করছিল। আততায়ীরা কাছের একটি বীচের দিকে যায় এবং লাফ দিয়ে একটি স্পীড বোটে ওঠে। স্পীড বোটটি গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেখানে অপেক্ষমাণ একটি জাহাজে গিয়ে ওঠে। ঐ জাহাজটি সরকারিভাবে হাইকা থেকে ইটালীতে সিমেন্ট বহন করছিল।

ঐ জাহাজেই অবস্থান করছিলেন শাবতাই শাভিত নিজে। এই অভিযানের খুটি নাটি অত দূর থেকে মনিটর করছিলেন। পুরো রুটই ছিল ওয়েল প্লানড। ফলে কেউই হত্যাকাণ্ডের পর মোসাদের ঐ দুই এজেন্টকে অনুসরণ করতে পারেনি। জাহাজে ওঠার পর মোসাদের ঐ দুই এজেন্ট নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যান।

সাকাকীর মৃত্যুর পর তার সহকর্মী ইসলামিক জিহাদের লোকজন রহস্যজনক ঘটনা উদঘাটনের চেষ্টা করে। কে এই বিশ্বাসঘাতক যে মোসাদের কাছে সাকাকীর সফরের যাবতীয় খুঁটিনাটি পাচার করল?

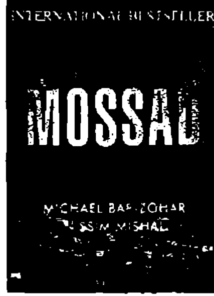
হত্যাকারীরা সাকাকীর যাবতীয় গতিবিধি জানত – কবে তিনি মাল্টা, কবে লিবিয়া যাবেন ইত্যাদি। এমনকী তার ফ্লাইট নম্বর, তার ভুয়া পরিচয়পত্র, দামেস্কে ও মাল্টায় তার ফেরার দিনক্ষণ পর্যন্ত। পাঁচ মাস অনুসন্ধান শেষে ইলামিক জিহাদ এক ফিলিস্তিনি ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এই ছাত্র সাকাকীর খুবই ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিল। তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ীও করা হয়। ছাত্রটি প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে সবকিছু স্বীকার করে নেয়। উল্লেখ্য, বুলগেরিয়া পড়ার সময় মোসাদ উক্ত ছাত্রটিকে তাদের দলে ভেড়ায় এবং নিয়োগ দেয়। তার মোসাদ গডফাদাররা তাকে দামেস্কে ফিরে যেতে বলে এবং সাকাকীর দলে যোগাদনের নির্দেশ দেয়। পরবর্তী চার বছরে ছাত্রটি সাকাকীর আস্থা অর্জন করে এবং সাকাকীর কর্মকাণ্ড জানত মাত্র কয়েকজন – তাদের একজনে পরিণত হয়।

হামাস ও হেজবুল্লাহ তাদের সম্পদের বিশাল একটা অংশ সামরিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করলেও ইসলামিক জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সন্ত্রাস। এদের একটাই উদ্দেশ্য – ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ। এমনকী ফিলিস্তিনিদের বেশ কিছু সংগঠনও বিশ্বাস করে আত্মঘাতী সন্ত্রাসের আদর্শগত পিতা হলেন সাকাকী। ইসলামের পবিত্র ও মহান শিক্ষাকে সে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও হত্যাকান্ডে উৎসাহিত করে।

সাকাকীর সংগঠনের রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসী হামলার তালিকা দীর্ঘ। ১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই তেল আবিব থেকে জেরুজালেমগামী বাসে হামলা চালিয়ে সাকাকীর সংগঠন ১৬জন হত্যা করে। ১৯৯০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কায়রোর সন্নিকটে একটি পর্যটন বাসে বোমা মেরে ঐ সংগঠন ৯ জনকে হত্যা করে। ২০০০ সালের ২০ নভেম্বর দক্ষিণ ইসরাইলের আরেকটি বাসে বোমা মেরে তারা ৮ জনকে হত্যা করে। ১৯৯৪ সালের ১১ নভেম্বর গাজায় এক আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ঐ সংগঠন তিন সৈন্যকে হত্যা করে। বেইট লাডের লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ শুরুতেই দেয়া হয়েছে। সেখানে ২১জন নিহত হয়। সাকাকীর জন্য মৃত্যুদণ্ড যথার্থই ছিল যা মাল্টায় মোসাদ কার্যকর করেছে। সাকাকীর মৃত্যুর পর ইসলামিক জিহাদের কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। নেতা সাকাকীর মৃত্যুর পর দলের প্রায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে বেশ কয়েকবছর কেটে যায়।

ইসরাইল কখনোই হত্যার কথা স্বীকার করেনি। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী রবীন বলেছেন, আমি সাকাকীর হত্যাকান্ডের ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে যদি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েই থাকে এজন্য আমি দুঃখিত নই।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে আইজাক রবীন নিজে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। কিন্তু এই ঘটনা কোন ফিলিস্তিনি ঘটায়নি, ঘটিয়েছে এক ইহুদী ধর্মান্ধ।



পারমানবিক গোয়েন্দার জন্য মধুর ফাঁদ

ডিমেনো আনবিক চুল্লীতে সে একজন টেকনিশিয়ানের কাজ করত। এটি ইসরাইলের সর্বোচ্চ সুরক্ষিত ও গোপনীয় পারমাণবিক চুল্লী। বিদেশি গণমাধ্যম এমনকী বেশ কিছু সরকার মনে করত ইসরাইল অতিগোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। ডিমোনো পারমাণবিক কেন্দ্রে চাকুরী পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু চাকুরি প্রার্থীর যাবতীয় তথ্য কয়েকটি সংস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে। এত সব পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর কাছে অসহনীয় মনে হলেও এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। সবকিছু সন্তোষজনক হলেই কেবল সে ডিমোনা পারমাণবিক চুল্লীর গোপন কেন্দ্রে ঢুকতে পারে। আর চাকুরী পেলেই তার উপর নজরদারি শেষ হয়ে যায় না।

মোরভেটি ভানু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে চাকুরীর আবেদন করে। নিউক্লিয়ার রিসার্চ ফ্যামিলিটি অফিসে সে চাকুরী পেয়ে যায়। জায়গাটি বীরসেবার কাছে অবস্থিত। এই অফিসে রুটিন মাফিক নিরাপত্তার কাজ হত। ফলে সহজেই সে চাকুরী পেয়ে গিয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে যে কী করেই বা এই চাকুরী পেল। কেননা সে একজন গোড়া বামপন্থী। তার বন্ধুরা আবার দেশের কম্যুনিষ্ট এবং ইহুদি বিরোধি রাকাহ পার্টির সদস্য। ভানু নিজে তাদের বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছে। কট্টর ফিলিস্তিনপন্থী মিছিলে তাকে প্লাকার্ড নিয়ে বক্তৃতা করতে দেখা গেছে। এমনকী সংগঠনের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারও দিয়েছে। সে রাকাহ সন্ত্রাসীদের

তার ফ্ল্যাটে দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছে। সেখানে তাদেরকে তাদের সংগঠনে যোগ দিতে বলেছে। আর তাদের সংগঠনটি এককথায় প্রকাশ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরোধি। তরুণ আরব মৌলবাদীদের সংগটন এটি।

বেন গুরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে সে তালিকাভুক্ত ছাত্র এবং চরভাবাপন্ন মনোভাবের জন্য সে ব্যাপক পরিচিত। ভান্নুর মধ্যে অনেক গুণেরই সমাহার ঘটেছিল। তবে সে ছিল অস্থির প্রকৃতির রাবাহ সমর্থক হওয়ার সে ছিল উগ্র দক্ষিণপন্থী বর্ণবাদী রাব্বি কাহানের ঘোর সমর্থক। এর পরে সে সমর্থক হয়ে যায় কট্টর ডানপন্থী দল হাটেছিয়ার (সংস্কারবাদী) সমর্থক এবং লিকুদ পার্টিকে ভোট দেয়। আরও পরে সে কট্টর বামপন্থী বনে যায়।

তার দাবি ১৯৮২ সালের বিতর্কিত লেবানন যুদ্ধ তার মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটায়। প্রায় একাকী থাকতে অভ্যস্ত এবং বলতে গেলে প্রায় বন্ধুহীন ভান্নু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সে মরক্কো বংশোদ্ভুত বলেই তার এত বঞ্চনা। এয়ারফোর্স একাডেমিতে ভর্তি হতে ব্যর্থতার কারণে তার মনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। তাকে পোষ্টিং দেয়া হয় ইঞ্জিনিয়ারিং করপাস। আইডি এক থেকে বাদ পড়ার পর তেলআবিবে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করে। মন পরিবর্তন করে সে বারসেবায় চলে যায়। সেখানে সে অর্থনীতি নিয়ে পড়তে শুরু করে। আবার মন পরিবর্তন করে দর্শন নিয়ে পড়তে শুরু করে। সে নিরামিশাশী হয়ে ওঠে; অতপর ভেগান। টাকার প্রতি তার লালসা বা দূর্বলতা তার বন্ধুদের অবাক ও চমৎকৃত করত। সে গর্ব করে বলত সে কাজ করতে অনাগ্রহী।

শেয়ার মার্কেটে স্মার্টলি বিনিয়োগ করতে চায়। সে তার ডাইরিতে শেয়ার মার্কেটকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় বলে উল্লেখ করে। সে লালরংয়ের একটি অডি গাড়ি চালাত এবং টাকা কামানোর জন্য সে ন্যাংটা হয়ে মডেল হয়েছিল। একবার ছাত্রদের এক পার্টিতে পুরস্কার জেতার জন্য সে তার জাঙ্গিয়া খুলে ফেলেছিল। তার জীবনব্যবস্থা তার নিজস্ব। এ নিয়ে কারো কিছু বলার নেই। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের সমর্থক ও রাখাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বৈকি। কেননা তার রাজনীতি ও জীবন যাপন বৈপরীত্যে ভরা।

একবার গোয়েন্দা সংস্থা সাবাক কর্মকর্তারা তাকে এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলে। তাকে সাবাক সতর্ক করেছে এমন একটি কাগজে তাকে সই করতে বলা হয়। কিন্তু ভানু সইতো করেইনি এবং সে যা যা করত তা বন্ধও করেনি।

ভানুর কর্মকাণ্ড নিয়ে সাবাব একটি রুটিন রিপোর্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের নিরাপত্তা পরিচালকের কাছে পাঠায়। ডিমোনা পারমাণবিক চুল্লীর পরিচালককে ভানু সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন মন্ত্রনালয়ের উক্ত কর্মকর্তা। ভানুর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হল না। তার পেছনে গোয়েন্দাদেরও লাগানো হল না। বিষয়টি ঘোরতর দায়িত্বে অবহেলা। এক্ষেত্রে সাবাকের স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়, ডিমোনা প্রকল্প, মন্ত্রনালয় সকলেই ভানুর ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিল। ফলে ভানু তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলই এবং কাউকে তার পরোয়া করার দরকার পড়ল না।



সিন্ডি

ডিমোনা পারমাণবিক চুল্লীতে ইনষ্টিটিউট ২ এ ভান্নু ছিল একজন অপারেটর। সংস্থার সর্বোচ্চ গোপনীয় বিভাগ এটি। ডিমোনোর ২৭শত কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১৫০ জনেরই প্রবেশাধিকার ছিল ইনষ্টিটিউট-২ এ ঢোকার। ভান্নুর ছিল দুটি ব্যাজ। একটি ডিমোনাতে প্রবেশের আরেকটি ইনষ্টিটিউট দুই এ ঢোকার।

ইনষ্টিটিউট বাইরে থেকে দেখলে দোতলা একটি ভবন বলে মনে হবে। কিন্তু যারা কৌতুহলী তাদের মনে জাগতেই পারে যে, দোতলা ভবনের আবার লিফট কেন। আসলে ইনষ্টিটিউ-২ এর এই হল এক বিরাট রহস্য। লিফটের অস্তিত্বের মূলে ছিল উপরে ওঠার জন্য নয়, নীচে নামার জন্য। এই ভবনের আন্ডার গ্রাউন্ডে রয়েছে ছয়টি তলা এবং এমনভাবে সাজানো গোছানো যে, নীচে যে তলা আছে তা মালুম করাটা দুঃসাধ্য। ভান্নু রাতের পালার শিফট ইনচার্জ ছিল এবং ভবন সম্পর্কে তার কিছুই অজানা ছিল না।

এই ভবনের দোতলায় একটি অংশে বিভিন্ন অফিস, আরেক দিকে ক্যাফেটরীয়া রয়েছে। নীচতলার কয়েকটি গেট দিয়ে ইউরেনিয়াম রড ট্রান্সফার করা হত। এগুলো চুল্লীতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে পাইপ ও বাল্ব রাখা হত। আন্ডার গ্রাউন্ডের দ্বিতীয় তলায় ছিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। বরান্দার নাম ছিল গোল্ডাস ব্যালকনি। খুবই গুরুত্বপূর্ন ভিজিটররা ব্যাপক যাচাই বাছাই শেষে এই ব্যলকনির নীচ দিয়ে প্রোডাকশন হল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। ভূগর্ভস্থ তিন তলায় টেকনিশিয়ানরা ইউরেনিয়াম রড দিয়ে কাজ করে। ভূগর্ভস্থ চার তলায় রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড সোর্স।

এর সাথেই যুক্ত উৎপাদন প্লান্ট। এখানে রয়েছে পৃথকীকরণের সুবিধাদি। এই পর্যায়ে চুল্লীতে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়। ভূগর্ভস্থ পঞ্চম তলায় বোমার কমপোনেন্টস প্রস্তুত করা হয় এবং ভূগর্ভস্থ সর্বোচ্চ নীচের তলায় একটি বিশেষ পাত্রে রাসায়নিক বর্জ্য জমা করা হয়। ভান্নু প্রতিটি ভূগর্ভস্থ তলা সম্পর্কেই সম্যক অবহিত ছিল।

ইসরাইলের ডিমোনা পরমাণু কেন্দ্রে ৯ বছর কাজ করার পর ১৯৮৫ সালে তার চাকুরী চলে যায়। চাকুরী যাওয়ার মূলে কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল না। ডিমোনার বাজেট হ্রাস করা হলে অন্যদের সাথে তার চাকুরীও চলে যায়। যদিও ডিমোনা থেকে সে ভাল ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায়। ভান্নু আবার ক্রুদ্ধ এবং

হতাশ হয়ে পড়ে। দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সে বিদেশে যেতে মনস্থ করে। এমনকী তার দেশের ফেরার ইচ্ছাও কম। তার প্রত্যাশা, এক কোটি কুড়ি লক্ষ ইহুদির ইসরাইলের বাইরে বসবাস। সেও যদি এভাবে নিজস্ব একটা থাকার জায়গা পেত। ভান্নু তার ফ্ল্যাট, গাড়ি বিক্রি করে এবং ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে নেয়। বত্রিশ বছর বয়স্ক ভান্নু তার ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে যায়। এর আগেও সে একবার ইউরোপ, একবার আমেরিকা ঘুরে এসেছে। তার ব্যাগে রয়েছে দুটি ফিল্মও। যা সে ডিমোনায় চুরি করে তুলেছিল।

প্রথমে সে গ্রীস আসে। পরে রাশিয়া, থাইল্যান্ড এবং নেপাল। কাঠমুন্ডুতে তার সাথে ইসরাইলের এক তরুণীর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তার নাম বলে মার্ড এবং প্রকাশ্যেই স্বীকার করে যে সে ছিল একজন বামপন্থী। কিন্তু শান্তিবাদী। তবে সম্ভবত সে আর ইসরাইল ফিরবে না।

কাঠমান্ডু শেষে ভান্নু আরও কতগুলো দেশ ঘুরে অস্ট্রেলিয়া আসে। প্রথমে সে সেখানে কিছুদিন অব জব করে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সে একাকী ছিল এবং তার আচরণ ছিল রহস্যজনক। এক সন্ধ্যায় সে শহরের সর্বোচ্চ অখ্যাত এলাকায় যায়। এলাকাটি চোর ডাকাত পতিতাদের স্বর্গরাজ্য। এখানেই সে একটি চার্চ দেখতে পায়। অসহায়, পাপী, নাদান, অপরাধী, ভবঘুরে, পতিতাদের জন্য শান্তির আবাসস্থল এটি।

এখানে ভান্নুর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে চার্চের যাজকের। পরোপকারী যাজক মুহূর্তেই বুঝে ফেলেন ভান্নুর জন্য একটি বাড়ি চাই, একটা পরিবার চাই। যাজক ভান্নুর সাথে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কয়েক সপ্তাহ ভান্নু ও যাজকের মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ন পরিবেশে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১৭ আগষ্ট ভান্নু খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। তার নতুন নাম জন ক্রসম্যান। উক্ত যাজকের সাথে ভান্নুর পরিচয় না হলে হয়ত সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করত কিম্বা অন্য কোন ধর্মে দীক্ষিত হত।

চার্চের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে ভান্নু ইসরাইলে কী কাজ করত সে কথা বলতে গিয়ে ইসরাইলের ডিমোনা পারমাণবিক চুল্লীর প্রসঙ্গ তোলে। ডিমোনায় সে গোপনে যে সব দুঃসাহসিক ছবি তুলেছিল তার একটি স্লাইড শো সে করার কথা বলে। চার্চের লোকজন তার কথায় উদাসী দৃষ্টিতে তাকায়। কেননা এ

সম্পর্কে তারা কিছু জানেও না আবার কোন ধারণাও নেই। ওই সভায় অস্কার নামে কলম্বিয়ার এক লোক ছিলেন। ঘুরে বেড়ানো ও সৌখিন সাংবাদিকতা করে সে। ভানু ও অস্কার চার্চের একটি কক্ষে একসাথে কিছুদিন ছিল এবং চার্চের সংস্কার কাজেও কিছুটা অংশ নিয়েছিল। অস্কার ভানুর কাছে থাকা ছবিগুলো গুরুত্ব বুঝতে পেরে এ ছবি দিয়ে প্রচুর টাকা কামানো যাবে বলে তাকে উৎসাহ দিতে লাগল।

ভানু পাগলের মত টাকা ভালবাসত। আবার তার মধ্যে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তির পথ উন্মুক্ত করারও একটা বাসনা কাজ করত। শান্তির অন্বেষায় ভানু পরমাণু কেন্দ্রের ছবি নিয়ে ইসরাইল ছাড়েনি। কিন্তু ইসরাইলের আনবিক বোমা থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা ও সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা মহান উদ্দেশ্য তার ভেতর ছিল বৈকি! ইসরাইলের পারমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে সে নিজে নিজে এক ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে গেল এবং কালে কালে সে ঐ বোমার বিরুদ্ধে কাজ করা তার প্রধান ধ্যান হয়ে উঠল।

ইসরাইলের পারমাণবিক কেন্দ্রের ছবি প্রকাশে সে ক্রমশ মরীয়া হয়ে উঠল। তবে ভানু একথাও বুঝত, ছবি প্রকাশ মানেই ইসরাইলের দরজা তার জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ইসরাইলে ঢোকামাত্র সে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ভানুর মধ্যে ছবি প্রকাশের ব্যাপারটি এখনো বেশ সক্রিয়। ভানু এবং অস্কার সিডনির একটি ফটো ল্যাবে গিয়ে ইনষ্টিটিউট-২ এ তোলা ছবিগুলো আমেরিকার ম্যাগাজিনের স্থানীয় অফিস এবং অষ্ট্রেলিয়ার টেলিভিশনে প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হল। সংবাদ মাধ্যমগুলোর ধারণা হল, ধাপপাবাজির মাধ্যমে ভানু এবং অস্কার কিছু ডলার কামিয়ে নিতে চায়। তারা বিশ্বাস করল না লাজুক প্রকৃতির ভানুর হাতে ইসরাইলের সবচে সুরক্ষিত পারমাণবিক কেন্দ্রের ছবি।

অস্কার স্পেন ও ইংল্যান্ডে গিয়ে ছবির মূল্য বুঝতে পারল। এ যেন টাকার পাহাড়ের মধ্যে পড়েছে তারা। লন্ডনের সানডে টাইমস ছবিগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারল। ছবির সাথে ভানু পরমাণু কেন্দ্রের কিছু গ্রাফও এঁকেছিল। কিন্তু সানডে টাইমস কোন বিশেষ রিপোর্ট প্রনয়নের ব্যাপারে খুব

সতর্ক। কেননা কয়েকদিন আগে তারা হিটলারের ডাইরী নামে যা কিনেছিল তা ছিল ভুয়া ও জাল। ফলে ভানুর ছবিগুলো তারা নানাভাবে পরখ করল।

এদিকে অস্ট্রেলিয়া টিভির এক কর্মকর্তার সাথে ক্যানবেয়ার ইসরাইলি দূতাবাসের সখ্যতা ছিল। তিনি কথা প্রসঙ্গেই জানালেন যে, রহস্যজনক এক ব্যক্তি তার দেশের পারমাণবিক কেন্দ্রের ছবি বিক্রিতে আগ্রহী। বিষয়টি ইসরাইলের এক সাংবাদিক জানতে পেরে তার দেশের পত্রিকায় নিউজ করে।

উল্লেখিত খবরে ইসরাইলের গোয়েন্দা বিভাগসমূহে যেন ভূমিকম্প হয়। কেননা ডিমোনা কেন্দ্রের সাবেক এক কর্মকর্তা পরমাণু কেন্দ্রের ছবি বিক্রিতে আগ্রহী। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক পরিচালক হেমি কারমন এই ঘটনায় হায় হায় করে ওঠেন। তিনি হতাশ কণ্ঠে বলেন যে, সময় মত আমরা কেন ভানুর ব্যাপারে কেন সিদ্ধান্ত নিলাম না।

ভানুর ক্রিয়াকর্ম ইসরাইল প্রাইম মিনিস্টারস ক্লাবে গিয়ে পৌছায়। প্রধানমন্ত্রী পেরেজ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী রবীন ও শামীর এই ক্লাবের সদস্য। তারা সকলেই জাতীয় ঐক্য সরকারের সদস্য। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন অবিলম্বে ভানুকে খুঁজে বের করে ইসরাইলে ফেরত আনতে হবে। তাদের সহযোগিদের কারো কারো মতে, ভানুকে ফেরত না এনে হত্যা করাই শ্রেয়। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ফোন তুলে মোসাদের প্রধানকে ডাকেন।

১৯৮২ সাল থেকেই মোসাদের নতুন পরিচালক রাহুম আদমোনি। তার জন্ম জেরুজালেমে। গোয়েন্দা দফতর আমানে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন আইজাক হাফিসের ডেপুটি। মোসাদের প্রধান ছিলেন তিনি ৭ বছর। কিন্তু গোয়েন্দাদের জন্য এই সময়টা মোটেও সুখকর ছিল না। বহু ঘটনা দুর্ঘটনায় মোসাদ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে যায়। ইহুদি এক নাগরিক বেসামরিক গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য ওয়াশিংটনে গ্রেফতার হন। এ সময়ই ঘটে ইরান কন্ট্রার ঘটনা। যার সঙ্গে ইসরাইল জড়িত ছিল। অসর্তকতার জন্য এ সময় বহু ইসরাইলি গোয়েন্দা বিদেশে গ্রেফতার হয়। তবে ইসরাইলের সর্বোচ্চ ক্ষতির কারণ হল মোরদেচাই ভানু। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেই মোসাদ প্রধান ভানুকে আটকের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। কম্পিউটারে এই

অভিযানের নাম দেয়া হয় কানিউক। মোসাদ প্রধান অষ্ট্রেলিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে একটি দল পাঠালেও কোন লাভ হয়নি। কেননা পাখি উড়ে গেছে লন্ডনে।

এদিকে অস্কারের সাক্ষাৎকার শেষে সানডে টাইমস সম্পাদক পিটার নামে এক তারকা সাংবাদিককে ভান্নুর সাথে সাক্ষাৎ করতে অষ্ট্রেলিয়া পাঠান। বিমানে উঠেই পিটার জানতে পারেন, ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা অস্কারের কাছ থেকে পাওয়া ছবিগুলোর সত্যতা উদঘাটন করেছেন। পিটার হাওনাম সিডনীতে ভান্নুর সাথে কথা বলে বুঝতে পারেন ঘটনা সব সত্যি। অস্কার ভান্নু সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে



ভান্নু

বলত যে ভান্নু একজন বিজ্ঞানী। ভান্নু জানায় যে, একথা সত্য নয়। সে একজন টেকনিশিয়ান মাত্র।

ভান্নু এবং পিটার লন্ডনে আসেন। সেখানে সানডে টাইমসের লোকরা ভান্নুর বিশদ সাক্ষাৎকার নেন। সে যা জানে সবই তাদেরকে অবহিত করে। ব্রিটিশদের সে আরও জানায়, ইসরাইল একটা নিউট্রন বোমাও বানাচ্ছে। এই বোমার বিশেষত্ব হল প্রানী বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না কিন্তু ভবনাদি এবং দালাকোঠার কোন ক্ষতি হবে না। ইনস্টিটিউট-২ এ কীভাবে বোমা বানানো হয় তার পদ্ধতিও ভান্নু সবাইকে জানায়। এই পর্যায়ে ভান্নুকে বেশ নার্ভাস লাগছিল। ইসরাইলি গোয়েন্দারা তাকে মেরে ফেলতে পারে কিম্বা অহপরন-এই ভয় তাকে আতঙ্কিত করে। পত্রিকাটি তাদের সব কর্মীকে ভান্নুর

সেবায় নিয়োগ করে। ভানু যাতে একাকী রাস্তা ঘাটে হাঁটাহাটি না করে সে ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা হয়।

সানডে টাইমস ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ভানুকে এক লক্ষ ডলার দিতে চায় তার গল্প ও ছবির জন্য। এর মধ্যে ৪০ ভাগ পত্রিকায় ছাপানো বাবদ এবং ২৫ ভাগ বইয়ের স্বত্ব হিসেবে। তবে বই যদি বের হয়। টাইমসের লোকজন জানায় যে, তাদের মালিক হলেন রূপার্ট মারডক। একই সাথে তিনি টুয়েন্টি সেঞ্চুরি ফক্স নামের সিনেমা কোম্পানীর মালিক। এবং তিনি ভানুর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি ছবি বানাতে আগ্রহী। রবার্ট ডি নিরো ভানুর চরিত্রে অভিনয় করবেন। লন্ডনে ভানুর মেজবানরা সেখানে তার সেবাযত্নের কোন ত্রুটি রাখেনি। যদিও তাকে কোন মেয়ে মানুষ দেয়া হয়নি। কিন্তু সেক্স করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে সে।

কোলে মাথা রাখার জন্য একটা মেয়ে মানুষ তার চাই ই চাই। ইনসাইড স্টাফ রোয়েনা ওয়েবস্টার ভানুর সঙ্গ দিতে বটে কিন্তু সে কিছুতেই ভানুর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি নয়। সেক্স করার জন্য ভানু শুধু তার পায়ে ধরতে বাকী রেখেছিল। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, সানডে টাইমস কর্তৃপক্ষ ভানুর সব কথা বুঝেছিল, সব আবদার মিটিয়েছিল কিন্তু তার যে একটি মেয়ে মানুষ দরকার এই কথাটা বুঝতে পারেনি। আবার ভানু যে ইসরাইলের গোয়েন্দাদের ভয়ে কাতর এই সহজ সত্যটাও ঐ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে পারেনি। সানডে টাইমস তাদের এক সাংবাদিককে ভানুর খোঁজ নিতে ইসরাইলে পাঠায়। এই সাংবাদিক ইসরাইলের এক সাংবাদিকের সাথে ভানুর ব্যাপারে কথা বলেন।

ইসরাইলি সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্য গোয়েন্দা দল সাবাককে জানিয়ে দেয়। এর কয়েক ঘন্টার মধ্যে মোসাদের একটি টিম লন্ডনে পৌছে যায়। এই টিমের নেতৃত্বে ছিলেন মোসাদ প্রধানের ডেপুটি সাবতাই সাভিত। এই অভিযানের সেকেন্ড ডেপুটি এবং কায়সারেরায়ের প্রধান বেনি জিভি। মোসাদের এজেন্টরা আলোকচিত্র সাংবাদিকের বেশে সানডে টাইমস পত্রিকার ভবনের সামনে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান নেয়। এই সময় ঐ পত্রিকায় ধর্মঘট চলছিল। মোসাদের লোকজন ধর্মঘটিদের ছবি তোলে। কয়েকদিনের মাথায় মোসাদের এজেন্টরা মোটামুটি ভানুকে চিহ্নিত করে ফেলে। এবং তাকে সারাক্ষণ নজরে

রাখতে সক্ষম হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ভান্নু লেইচেস্টার স্কোয়ারে আসে। জায়গাটি পর্যটকদের খুব প্রিয়। একটি নিউজ পেপার স্টান্ডে ভান্নু ফারাহ ফসেটের মত এক তরুণীকে দেখতে পায়। ফারাহ্ ফসেট টিভি শো চার্লিস এঞ্জেলসখ্যাত।

ভান্নুর মন গলে যায়। ভান্নুর কাছে স্বর্ণকেশী এই মেয়েটি সৌন্দর্যের রানী যেন। ঐ নিউজ স্ট্যান্ডে দু'জনার চোখাচোখি হলে সে চোখ যেন আটকে যায়। এ চোখাচুখি যেন অর্থপূর্ণ। মেয়েটি পত্রিকাটি কিনে তার পথেই যাত্রা করে। ভান্নু অন্য পথে রওয়ানা হলেও আবার মেয়েটির কাছে ফিরে এসে তার সাথে কথা বলতে চায়। মেয়েটি হাসি দিয়ে তার সম্মতি জানায়। দু'জনের মধ্যে হালকা বিষয়াদি নিয়ে কথাবার্তা হয়। মেয়েটি জানায় তার নাম সিন্ডি। ফিলাডেলফিয়ার এক ইহুদি বিউটিশিয়ান। ছুটি কাটাতে ইউরোপে এসেছে।

ভান্নু ক্রমশঃ সন্দিগ্ন হয়ে উঠেছে। সানডে টাইমসের লোকেরা তাকে জেরা করে করে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। তার উপর লেখাটাও তারা স্থগিত করেছে। ইসরাইলি গোয়েন্দাদের ভয় তাকে আরও কাবু করে ফেলেছে। কেননা সানডে টাইমস বলেছে, এই প্রতিবেদনের ব্যাপারে ইসরাইলের ভাষ্যও তারা জানবে। এর কারণ হিসেবে সানডে টাইমস বলেছে, তাদের পত্রিকাটি অত্যন্ত মর্যাদাকর। অন্য পক্ষের ভাষ্য নেয়া তাদের একটা রেওয়াজ। কিন্তু ভান্নু এসব কথায় খুশি হতে পারছিলেন না। তার আশংকা ছিল এসব করতে যাওয়া মানে ইসরাইলি গোয়েন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি। এদিকে সে একাকী, ক্ষুব্ধ এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আর এই সময়েই সিন্ডির আগমন।

সিন্ডিকে মস্করা করে ভান্নু জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মোসাদের পক্ষ থেকে এসেছো। সিন্ডি বলে, না না আমি মোসাদের কিছু নই। আচ্ছা মোসাদ কী। সিন্ডি ভান্নুর নাম জানতে চায়। ভান্নু জানায় তার নাম জর্জ। আসলে ভান্নু জর্জ নামেই হোটেলে উঠেছে। সিন্ডি বলে, কাম অন। তুমি জর্জ নও।

ওরা একটা কাফেতে বসল। ভান্নু তার প্রকৃত নাম মেয়েটিকে বলল। সানডে টাইমসকে ঘিরে সে যে সমস্যায় পড়েছে তাও সিন্ডিকে বলল। সিন্ডি তাকে জানাল যে, সে সহসাই নিউইয়র্কে যাচ্ছে। সেখানে সানডে টাইমসের থেকেও ভাল পত্রিকার ব্যবস্থা সে করে দিতে পারবে। এমনকী ভাল আইনজীবীও সে দিতে পারবে।

ভান্নু সিন্ডির কোন কথাই আসলে কানে নিচ্ছিল না। আসলে ভান্নু প্রথম দর্শনেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে। কয়েকদিনের ব্যবধানে ভান্নু সিন্ডির সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করল। তার মতে, এই দিনগুলিই তার জীবনের সেরা। তারা হাত ধরাধরি করে পার্কে ঘুরল। সিনেমা দেখা, গান শোনা সবই এক সঙ্গে চলত। আর চুমুর বন্যা বইয়ে দিত দু'জনে। এই সুইট কিসের কথা ভান্নুর পক্ষে কখনোই ভোলা সম্ভব নয়।

সিন্ডি গভীর ও গাঢ়ভাবে ভান্নুকে চুমু উপহার দিয়ে গেলেও তার সাথে বিছানায় যেতে ঘোরতর আপত্তি জানাল। সিন্ডি বলেন, সে তার হোটেলে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে থাকছে। সে ভান্নুকে তার হোটেল কক্ষে কখনোই আনবে না এবং ভান্নুর হোটেল কক্ষেও যাবে না। সিন্ডি বলল, তুমি লন্ডনে অস্থির অবস্থায় আছো লন্ডনে কিছু হবে না। তুমি আমার সাথে রোমে চল। সেখানে আমার বোনের একটা ফ্ল্যাট রয়েছে। সেখানে আমরা চমৎকার দিন কাটাতে পারব। সেখানেই তুমি শান্তি পাবে এবং তোমার কষ্ট ভুলে যাবে।

ভান্নু রোমে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু সিন্ডি রোমে যেতে বদ্ধপরিকর। একটা বিজনেস ক্লাসের টিকেটও কিনল। ভান্নু যখন রোমে যেতে রাজি হল তখন তার জন্যও একটা টিকেট কেনা হল। সিন্ডি বলে, এই টিকেটের টাকা তুমি আমাকে পরে দিয়ে দিও। ভান্নু যদি সিরিয়াস ধরনের লোক হত, যদি রিজনাবল হত তাহলে সে বুঝতে পারত সে প্রেমের ফাঁদে পড়েছে। কেননা একটি মেয়ের সাথে রাস্তায় দেখা হল, পরিচয় হল এবং তার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত-এতো যুক্তির কথা নয়। এমনকি লন্ডনে কোন সেক্স হল না বলে রোমে তাকে তার বোনের বাড়িতে সেক্স করতে নিয়ে যাচ্ছে এসব ভান্নুর বোঝা উচিত ছিল। এমনকি তাকে টিকেট কিনে দিল বিমানের যাকে সে ভাল করে জানেই না।

ভান্নুর আশা রোমে গিয়ে অবশ্যই তাদের সেক্স হবে। যে কোন সেন্সসিবল লোক উপসংহার টানবে যে, সিন্ডির পুরো আচরণই সন্দেহজনক। তবে এক্ষেত্রে মোসাদের প্রশংসা করতেই হয়। মোসাদের মনোবিজ্ঞানীরা ঠিকই বুঝেছিল, ভান্নু এই সময় কী চায়। এই মনোবিজ্ঞানীরা আরও বুঝেছিল, সুইট কিস দিয়েই ভান্নুকে প্রেমে অন্ধ করে দেয়া যাবে এবং আরও মিষ্টি মধুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে পটানো যাবে।

সানডে টাইমসের পিটার হাওনাম একজন সংবেদনশীল মানুষ। যখন তিনি সিন্ডির কথা শুনলেন তখন তার মনে হল মস্ত ভুল হয়ে গেছে। তিনি ভান্নুকে সিন্ডির সাথে দেখা করতে বারবার নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এতে কোন কাজ হয়নি। ভান্নু সিন্ডির প্রতি এমনভাবে মজেছে যে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই তাদেরকে পৃথক করে।

ভান্নু পিটারকে একত্রে গাড়ি চালিয়ে তাকে একটি ক্যাফেতে পৌঁছে দিতে বলে। ঐ ক্যাফেতে অপেক্ষমাণ সিন্ডি। পিটার এদিন সিন্ডিকে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। পিটার যখন শুনলেন ভান্নু শহর ত্যাগের কথা ভাবছে কয়েকদিনের জন্য, তখন পিটার তাকে নিষেধ করেও কোন লাভ হয়নি। তারপর পিটার ভান্নুকে লন্ডন ত্যাগ না করার জন্য বলেন। পিটার তার পাসপোর্ট হোটেল রিসিপশনে না রাখারও পরামর্শ দেন। পিটারও ধারণা করতে পারেননি যে, সিণ্ডির সাথে শোয়ার জন্য ভান্নু রোমে চলে গেছে।

রোমে ভান্নুর সাথে সিন্ডি শুতে রাজি হয় একেবারেই ভিন্ন একটি কারণে। ইসরাইল ব্রিটিশ মাটিতে ভান্নুকে অপহরণ করতে আগ্রহী নয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী পেরেস ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লৌহমানবী মার্গরেট থ্যাচারের সাথে বিরোধে জড়াতে চাননি। মোসাদ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনে কাজকর্মে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। কেননা কয়েক মাস আগে জার্মান কর্তৃপক্ষ একটি টেলিফোন বুথে ৮টি ব্রিটিশ জাল পাসপোর্ট উদ্ধার করে। ঐ পাসপোর্টের ট্যাগের মাধ্যমে ইসরাইলি দূতাবাসের যোগসূত্র পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়। মোসাদকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব নিয়ে সে কখনো ছলচাতুরির আশ্রয় নেবেনা।

এক্ষেত্রে রোম হল সম্ভাব্য সেরা স্থান। মোসাদ এবং ইটালীর সিক্রেট সার্ভিসের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ এবং গভীরে প্রোথিত। মোসাদ প্রধান এবং ইটালীর সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান এডমিরাল ফুলভিও মাটিনির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এবং ইটালীতে যেভাবে অস্থিরতা বাড়ছে তাতে নিশ্চিত যে ভান্নুর অপহরণের বিষয়টি কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। ১৯৬৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সিন্ডি ও মর্ডি হাতে হাত রেখে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে উঠে বসে। রাত ৯টায় দুই প্রেমিক যখন ল্যাণ্ড করে ইটালীর বহু লোক তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে। ভান্নু সেই পুষ্পস্তবক গাড়িতে রেখে সিন্ডির বোনের বাড়িতে যাচ্ছে। পথে বিশেষ করে

সিন্ডি তার প্রিয় মানুষ ভানুকে বেশ কয়েকবার জড়িয়ে ধরে। ভরিয়ে তোলে চুমুতে চুমুতে।

একটি ছোট্ট বাড়ির সামনে গাড়িটি থামলে একটি ছোট্ট মেয়ে দরজা খুলে দেয়। ভানুই প্রথমে বাড়িতে ঢোকে। হঠাৎ করেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায় এবং দুটি লোক তার উপর জাম্প দেয় এবং দেয়ালের সাথে চেপে ধরে। ভানু লক্ষ্য করে এদের মধ্যে একজন স্বর্ণকেশী। যখন তার হাত-পা বাঁধা হচ্ছিল তখন মেয়েটি তার হাতে নিডল দিয়ে কিছু পুশ করে। এভাবে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয় পড়ে ভানু।

একটি কমার্শিয়াল ভ্যান ভানুর অচেতন দেহটা শহরের উত্তরাংশে নিয়ে যায়। ভ্যানটি বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চলছিল। ভানুর পাশে দুজন পুরুষ এবং এক মহিলা বসা ছিল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভানুকে আরেকটি ইঞ্জেকশন দেয়া হয়। এদিকে সিন্ডি লাপাত্তা হয়ে গেছে। ভ্যানটি লা মেনজিয়া বন্দরে পৌছে। ভানুকে একটি স্ট্রেচারে করে দ্রুতগামি একটি স্পীড বোটে তোলা হয়। সেটি উন্মুক্ত সাগরের দিকে এগুতে থাকে। সেখানে অপেক্ষমাণ ছিল ইসরাইলের একটি জাহাজ-নাম তাপুন। আরেকটি সূত্র মতে, এর নাম ছিল এস এস নাগা। জাহাজের ক্রুদের তাদের লাউঞ্জে ঢুকে যেতে নির্দেশ দেয়া হল। কিন্তু যারা ডিউটিরত ছিল তারা স্পিড বোট এগিয়ে আসতে দেখল। ভানুকে অচেতন অবস্থায় জাহাজে তুলে একটি কেবিনে তুলে তালা মেরে দেয়া হল। জাহাজটি অবিলম্বে ইসরাইলের পথে যাত্রা করল।

ভানু পুরো সময়টা ক্ষুদ্র ঐ রুমে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকল এবং কোথাও সিন্ডিকে দেখতে পেল না। সিন্ডির ব্যাপারে সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কোথয় গেল সিন্ডি। ভানুর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না যে, সিন্ডি মোসাদ টিমের একজন সদস্য। সম্ভবত সেই রাতেই সে ইরানে চলে গেছে। ভানুর সফর সঙ্গি হিসেবে জাহাজে যে মহিলা রয়েছেন, তিনি একজন ডাক্তার। ভানুকে ইসরাইলের একটি নেভি মিসাইল বোটে তোলা হল। সেখানে সে পুলিশ কর্মকর্তা ও সাবাক গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হল। তারা ভানুকে গ্রেফতার করে এ্যামকেলনের সিকমা জেলখানায় নিয়ে গেল।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সময়ই ভানু বুঝল যে, তাকে ইসরাইল নেয়ার সময়ই লন্ডনের সানডে টাইমস তার উপর ধারাবাহিক ছাপতে শুরু করেছে। ঐ প্রতিবেদনে ছবি এবং ড্রয়িংও ছাপা হয়। সারা বিশ্বে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। সানডে টাইমস উল্লেখ করে যে, ইসরাইলের পরমাণু দক্ষতার যে ধারণা ছিল তা ছিল ভুল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, তারা মনে করেছিলেন ইসরাইলের হাতে ১০ থেকে ২০টি প্রিমিটিভ আণবিক বোমা রয়েছে। কিন্তু ভানুর তথ্যে প্রমাণিত হয় যে, ইসরাইল পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে এবং তাদের হাতে অত্যাধুনিক ১৫০ থেকে ২০০টির মত পারমাণবিক বোমা রয়েছে।

একই সাথে ইসরাইলের হাইড্রোজেন ও নিউট্রন অস্ত্র বানানোর সক্ষমতা রয়েছে। ভানু এই স্পর্শকাতর সংবাদ প্রকাশের পর আরও অস্থির হয়ে উঠল। সে ভয় পেয়ে গেল ইসরাইলিরা তাকে মেরে ফেরবে। সে সিন্ডির জন্যও চিন্তিত ছিল। তাকে যখন বলা হয় সে মোসাদের লোক তখনো সে তা বিশ্বাস করতে চাইছিল না।

চল্লিশ দিন বিশ্ববাসী ভানু সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না। মিডিয়া ছাপতে শুরু করল যে, সত্য নিয়ে কারচুপি করে লাভ নেই। ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা কী করে ভানুকে লন্ডন থেকে অপহরণ করে ইসরাইলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত ছাপতে শুরু করল। অনেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে লিখল, একটি প্রমোদতরীতে এক তরুণীসহ ভানুকে ইসরাইল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ এমপিরা লন্ডনে পুরো ঘটনার একটি সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করল এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব পোষণের দাবি জানাল। ভানুকে মধ্য নভেম্বরে সরকারিভাবে অভিযুক্ত করা হল। তাকে এরপর পুনঃপুনঃ আদালতে নেয়া হচ্ছিল।

সে ভাল করেই জানত জনসমাগমের কোন দিকটায় রিপোর্টার থাকে। একবার ভানু পুলিশের গাড়ির পেছন দিকটায় বসল। রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের ভিড় দেখে সে তার হাত জানালায় রাখল। এর কারণ তার হাতে যা লেখা রয়েছে তা যেন সাংবাদিকরা পড়তে পারে। ভানুর হাতে সংক্ষিপ্তাকারে যা লেখা ছিল তাহল ১৯৬৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাকে রোমে অপহরণ করে। সে বিমানযোগে রোমে এসেছিল। সব কথা জানাজানির পর জেরুজালেম ও লন্ডনের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। কেননা, এটা পরিষ্কার ভানু লন্ডন ত্যাগ

করেছে স্বেচ্ছায় এবং এটি ছিল একটি নিয়মিত ফ্লাইট। এদিকে রোমে গোয়েন্দা প্রধানের মাথায় হাত। তিনি ক্রুব্ধ এবং হতাশ। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ইসরাইল সে ব্যথায় মলম লাগাতে সক্ষম হয়।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ভান্নুর ১৮ বছর জেল হয়। কিন্তু দেশের বাইরে তাকে গোয়েন্দা বা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। তার নামে ইউরোপ ও আমেরিকায় বেশ কিছু সংগঠন গজিয়ে ওঠে। ভান্নুকে শান্তির স্বপক্ষে একজন ঘোরতর সাহসী যোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেননা ভান্নুই একমাত্র ব্যক্তি যে ইসরাইলের পারমাণবিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।



মারডকের অনেক স্ত্রীর একজন জেরী হল

ভান্নু সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা সঠিক নয়। ভান্নু কখনোই ডিমোনা পারমাণবিক কেন্দ্রে কাজ করার সময় ইসরাইলের পারমাণবিক কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত গঠন বা ধ্বংসে মনোনিবেশ করেনি। যদি ঐ কারখানা বা চুল্লী লে অফ করা না হতো তাহলে হয়ত আজও সে সেখানে কাজ করত। আবার যখন সে দেশ ত্যাগ করে তখনো কিন্তু পবিত্র যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সে কোন তাড়াহুড়ো করেনি। সে বিশ্ব সফর করছিল। অস্ট্রেলিয়ায় সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। যদি অসকারের সাথে তার যোগাযোগ না হত হয়ত তার কাছে তোলা ছবিগুলো গোল্ডা ব্যালকনিতে রাখত। কিন্তু বিশ্বের মানুষ তাকে

একজন ইসরাইলের বিপজ্জনক পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করছে। এক মার্কিন দম্পতি ভান্নুকে পুত্র হিসেবে দত্তক নিয়েছেন। এদিকে খ্রীষ্টানদের একটি অংশ তাকে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

১৮ বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভান্নু জেরুজালেম চার্চে বসবাস বেছে নেয়। এখনো ইসরাইলের প্রতি তার আকাশচুম্বী ঘৃণা। সেখানে বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। হিব্রু ভাষায় কথা বলতেও তার আপত্তি। নাম বলে জুন ক্রসম্যান। আগের নাম নয়। আরব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সে আরব বা ফিলিস্তিনি বউ খুঁজছে। বিজ্ঞাপনে ইসরাইলি কোন মেয়ের আবেদনের প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ থাকছে।


সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার

আর সিন্ডি! কী তার পরিচয়। যেহেতু মোসাদের হাতে বেশী সময় ছিল না ফলে সিন্ডি তার বড় বোনের নাম ব্যবহার করেছে-সিন্ডি হানিন। তার পাসপোর্টও ব্যবহার করেছে। এ কারণেই ব্রিটিশ ও ইসরাইলি সাংবাদিকরা তার প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে। ঐ সাংবাদিকরা জেনেছে, সিন্ডির আসল নাম চেরিল বেন টভন নী হানিন। তার বাবা একজন মার্কিন বিলিয়নিয়ার। টায়ারের ব্যবসা করে সে কোটি কোটি ডলার বানিয়েছে। একজন নিবেদিতপ্রাণ ইহুদি এবং সতের বছর বয়সে আমেরিকা থেকে

ইসরাইলে চলে আসে। সে আইডি এফ এ চাকুরী করত এবং আমান গোয়েন্দা বিভাগের এক সাবেক কর্মকর্তার স্ত্রী।

মোসাদের একজন এজেন্ট তাকে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়। তার আইকিউ খুবই উচ্চমানের। উদ্দেশ্য সাধনে সে সফল এবং তার মার্কিন পাসপোর্ট এক্ষেত্রে খুব কার্যকর। সে দু'বছরেরও প্রশিক্ষণকাল শেষ করেছে। তারপরই তাকে তড়িঘড়ি করে অভিযান পরিকল্পনাকারী দল কানিউকের সঙ্গে লন্ডনে চলে যেতে হয়। ভানুর অপহরণের পর পত্রপত্রিকাগুলো সিন্ডিকে নিয়ে মেতে উঠলে সে অপারেশনাল কার্যক্রম থেকে পদত্যাগ করে।

বর্তমানে চেরিল হানিনবেন টভ ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে বসবাস করে। সে আর তার স্বামীর সেখানে রয়েছে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা এবং ধর্মভীরু ইহুদি মার্কিন পরিবার হিসেবে সেখানে বসবাস করে। ভানুর ঘটনায় মোসাদের গোয়েন্দা হিসেবে চেরিলের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর তার সহকর্মীদের মনে অনেক দুঃখ। কেননা চেরিলের মত স্মার্ট, সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলা আর আজ তাদের প্রতিষ্ঠানে নেই। কারণটা হল, ইসরাইল যে ভানুকে হাতে পেল তার কৃতিত্ব চেরিলের। এবং ইংল্যান্ড থেকে ভানুকে বের করে দেয়ার ক্ষেত্রে কোন আইনও ভাঙ্গেনি।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট ভানুকে নিয়ে এমপিদের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে সকলেই আশ্বস্ত হন যে, ব্রিটিশ মাটিতে কোন অপহরণ সংঘটিত হয়নি ভানুকে নিয়ে। মোসাদ এই নিষ্কৃতি বহু দিন পায়নি। দু'বছর পরে ঘটে আরেক কেলেংকারি। মোসাদ এজেন্ট এরিয়ে রেজেব ও বারাদ এক ফিলিস্তিনিকে লন্ডনে ডাবল এজেন্ট নিয়োগ করেছিল। ফিলিস্তিনি ধরা পড়ে গ্রেফতার হয়। কিন্তু থ্যাচার লন্ডনের মোসাদ কেন্দ্র বন্ধ করে দেন এবং রেজেব ও বারাদকে বহিষ্কার করেন।

মোসাদ আবারও লন্ডনে ভালো থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। সবই ভালো চলছিল কিন্তু মাহবুব আল মাহবুবকে নিয়ে আবার শুরু হয় জটিলতা।

মোসাদ বিশ্বের ভয়ঙ্করতম গোয়েন্দা সংস্থা। ইসরাইলি এই সংস্থাটির দুঃসাহসিক অভিযান নিয়েই এই বই।

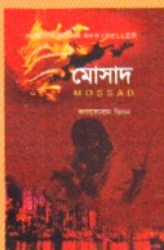
ইসরাইল নামক দেশটিকে যারা বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো, *মোসাদ* সে-রকম ৮/১০টি দেশকে কি নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে *মোসাদ* বই-এ।

ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্র ধ্বংস, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের সর্বত্র বিরোধ উস্কে দেয়া, তথ্যপ্রাচারসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মোসাদ অনৈতিক এবং নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়া গ্রহণ করে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় বলয়ের পরামর্শক হিসেবে কাজ করে *মোসাদ*।

মোসাদ তার দেশ ও পশ্চিমা স্বার্থে তাদের ভাষায় কথিত সন্ত্রাসী, বিপ্লবী, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, সরকার প্রধানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কখনো সরাসরি গুলি করে, কখনো বিষ প্রয়োগে, কখনো বা নারী লেলিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। আর এ-সব হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা ইসরাইল সরকারের প্রধান।

ইন্টেলিজেন্স যুদ্ধকে *মোসাদ* এত ‘উচ্চমার্গে’ নিয়ে গেছে যে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং গোয়েন্দাভিত্তিক কাহিনীর কোটি অনুরক্তকে তা মুগ্ধ না করে পারবে না।



আবিষ্কার
Quality Publication

MOSSAD
KAIKOBAD MILAN

Price : Tk. 250.00 or $ 10.00
Cover Design : J. I. AKASH
Printed in Bangladesh

ISBN: 978-984-92116-4-8

